জলদস্যুর গুপ্তধন

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাগর পারের অতিথি

ডোর বেল বাজতেই দীননাথ গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিল। তারপর ভেতরে এসে বললো, একজন সাহেব দেখা করতে এসেছেন। কদিন আগেও এয়োছিলেন। তখন আপনি ছিলেন না।

মেঘনাদ খবরের কাগজটা মুখের সামনে থেকে নামিয়ে বললো, বুঝেছি। ওঁকে এখানেই নিয়ে এস।

দীননাথ মাথা হেলিয়ে চলে গেল। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, হ্যাঁরে মেঘনাদ, এই সাত সকালে কোন সাহেবের আসার কথা ছিল?

মনে হচ্ছে লুই রিকার্দো। জাতে পর্তুগীজ। আসছেন লিসবন থেকে।

মানে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে? একেবারে সাগরপাড়ি দিয়ে? তা সাহেব ভদ্রলোক এ দেশে এসেছেন কি শুধু তোর সঙ্গে দেখা করার জন্যেই? এবার সত্যিই আমার কৌতূহল বাড়ে।

হ্যাঁ, তা বলতে পারিস অর্ণব। আমার কাছে ওঁর আসাটা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য-পূরণের জন্যেই!

মেঘনাদের কথা শেষ হবার আগেই একজন ঢ্যাঙা শ্বেতাঙ্গ মানুষ এসে ঘরে পা দিলেন। দেখে মনে হলো বছর তিরিশ বয়স। চওড়া গোঁফ। গাল পর্যন্ত নেমে আসা ঝুলপি। চোখের মণি কটা। আগন্তুক ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে ইংরাজিতে বললেন, মিঃ মেঘনাদ ভরদ্বাজ? প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর?

মেঘনাদ উঠে গিয়ে করমর্দন করে বললো, হ্যাঁ, আমিই। আর ইনি আমার অ্যাসিসটেন্ট অর্ণব সেন।

লুই রিকার্দো এগিয়ে এসে আমার সঙ্গেও

করমর্দন করলেন। তারপর আমরা সবাই আবার সোফায় বসলাম।

আমার কম্প্যুটার ওয়েবসাইটেই আপনার সম্পর্কে জেনেছি মিঃ ভরদ্বাজ। আপনি এই বেঙ্গল মুলুকে একজন সেরা প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর এবং দুঃসাহসী মানুষ।

মিঃ লুই রিকার্দোর কথা শুনে আর একবার অবাক হলাম। রহস্যভেদী মেঘনাদের পরিচিতি তাহলে এখন ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে? অবশ্য একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে এ আর আশ্চর্য কি!

মেঘনাদকে বলতে শুনলাম, মিঃ রিকার্দো, দুঃখের বিষয় একমাস আগে আপনি যখন ইন্টারনেটে আপনার মেসেজটা পাঠিয়েছিলেন, আমি কলকাতায় ছিলাম না। একটা ইনভেসটিগেশন কেস নিয়ে কিছুদিনের জন্যে বাইরে যেতে হয়েছিল। কিন্তু আমার ই-মেল পোস্ট বক্সে আপনার সে মেসেজ জমা ছিল। আপনি বোধহয় মেসেজটা পাঠিয়েই প্লেনে উঠেছিলেন, তাই না?

কি করে বুঝলেন? মেঘনাদের কথায় একটু যেন অবাক হন মিঃ লুই রিকার্দো।

শুনলাম কিছুদিন আগেও একবার আপনি এসেছিলেন। আমি তখনও ফিরিনি।

ও.........হ্যাঁ......হ্যাঁ....আসলে আপনাকে মেসেজটা পাঠানোর আগেই আমার পাসপোর্ট ভিসা সব রেডি হয়ে গিয়েছিল। প্লেনের টিকিটও কাটা হয়ে গিয়েছিল।

তা এখানে উঠেছেন কোথায়?

হোটেল ওরিয়েন্ট। দমদম এয়ারপোর্টের পাশেই।

এ পর্যন্ত আমি মিঃ লুই রিকার্দোর এখানে আসার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারিনি। এমন কী কারণ ঘটেছে যার জন্যে ভদ্রলোক সেই সুদূর পর্তুগাল থেকে ছুটে এসেছেন মেঘনাদের কাছে?

কথাটা এবার সরাসরি না জিগ্যেস করে পারলাম না।

উত্তরে মিঃ রিকার্দো বললেন, হ্যাঁ মিঃ সেন। কথাটা বলবার জন্যেই তো এতদূর এসেছি। একটা ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য আমার ভীষণ দরকার।

মিঃ রিকার্দো আরও কিছু বলার আগেই মেঘনাদ বললো, ই-মেল মারফৎ উনি অবশ্য ওঁর প্রয়োজনের কথাটা প্রাথমিক ভাবে আমায় জানিয়েছেন অর্ণব।

সেটা নিশ্চয়ই রহস্যভেদের কোনো ব্যাপার? প্রশ্ন করলাম।

সে তো বটেই, না হলে সুদূর পর্তুগাল থেকে উনি রহস্যভেদী মেঘনাদের শরণাপন্ন হবেন কেন। একটু থেমে মেঘনাদ বললো, তবে সে রহস্য নাকি জমে আছে আমাদের এই বাংলার দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে। সেখানে আছে ওঁর চারশো বছর আগের এক পূর্বপুরুষের পরম সম্পদ। সে সম্পদের সন্ধান উনি চান।

কথাটা আমার কাছে কেমন যেন হেঁয়ালির মতো মনে হলো। বললাম, এটা কি কোনো গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপার? মনের মধ্যে উথলে ওঠা কথাটা এবার আর সরাসরি মিঃ রিকার্দোকে জিগ্যেস না করে পারলাম না।

আমার প্রশ্নের উত্তরে মিঃ লুই রিকার্দোর মধ্যে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভাব লক্ষ্য করলাম। কয়েক সেকেন্ড অন্যমনস্ক ভাবে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আসল কথাটা আপনাদের বলতে গেলে আমাদের বংশের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের কথা বলতে হয়।

পূর্বপুরুষের কলঙ্ক আপনাকে যে স্পর্শ করবে না মিঃ রিকার্দো, তা আমি নিশ্চিত বলতে পারি। মেঘনাদ বোধকরি লুই রিকার্দোকে সান্ত্বনা দিয়েই বললো। তারপর ও যে কথাটা বললো তা শুনে শুধু মিঃ লুই রিকার্দোই নয়, আমি নিজেও তাজ্জব হয়ে গেলাম।

মেঘনাদ বললো, আমি জানি মিঃ লুই, আপনার পূর্বপুরুষ পেদ্রো রিকার্দো আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে একজন কুখ্যাত জলদস্যু ছিলেন এবং তাঁর কর্মকাণ্ড ছিল আমাদের এই বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে।

কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত অবাক চোখে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন লুই রিকার্দো, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আশ্চর্য! আপনি জানলেন কি করে?

খুব সহজে। মেঘনাদ খুব স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বললো, আমি বাইরে থেকে ফিরে আপনার পাঠানো মেসেজে যখন জানলাম চারশো বছর আগের আপনার কোন এক পূর্বপুরুষের স্মৃতি এবং হারানো সম্পদ সুন্দর বনে লুকোনো আছে এবং তা খোঁজার ব্যাপারেই আপনি আমার সাহায্য চান—তখনই আমি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করি। স্বাভাবিক ভাবেই ওই সময়ে দক্ষিণবঙ্গে পর্তুগীজ জলদস্যু বা হার্মাদদের কাণ্ডকারখানার কথা আমার মনে হয়। ইতিহাসে দেখেছি সে সময়ে সুন্দরবনেও তাদের ঘাঁটি ছিল। ওই সময়ের ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে কুখ্যাত

জলদস্যু পেদ্রো রিকার্দো নামটিও খুঁজে পেলাম।

মেঘনাদ তার বাকি কথাগুলো আর শেষ করতে পারলো না, তার আগেই মিঃ লুই রিকার্দো উঠে এসে নিজের দু'হাতের মধ্যে মেঘনাদের হাত দুটো চেপে ধরলেন। তারপর গদগদ কণ্ঠে যা বললেন তার অর্থ একটাই দাঁড়ায়, মিঃ ভরদ্বাজ, এখন আমি নিশ্চিত হলাম, আমি ঠিক জায়গাতেই এসেছি। আপনিই পারবেন আমার নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক হতে।

এরপর মিঃ রিকার্দো যা শোনালেন, তা মোটামুটি এইরকম ঃ

লুই রিকার্দোর বাস পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে একটু দূরে। সেখানে থাকেন তাঁরা দুই ভাই লুই আর ফ্রান্সিস। তাঁদের বাড়িটা বহু শতাব্দীর পুরনো। লুই রিকার্দো নিজে একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ। কিছুদিন আগে বাড়ির একটা পুরনো দেরাজের মধ্যে লুই হঠাৎই খুঁজে পান বহু যুগ আগের একটি ডায়রি। পার্চমেন্ট কাগজে লেখা কালো চামড়া বাঁধান ডায়রিটা লিখেছেন চারশো বছর আগে রিকার্দো পরিবারের এক পূর্বপুরুষ পেদ্রো রিকার্দো।

সেই ডায়রি থেকে জানা গেছে পেদ্রো রিকার্দো নাকি পেশায় একজন নাবিক ছিলেন। স্বভাবে ছিলেন যেমন দুর্দান্ত তেমনি বেপরোয়া। প্রথম জীবনে তিনি পাড়ি জমান ভারতবর্ষে। সে সময়ে ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাটদের রাজত্বকাল। এদেশে এসে পেদ্রো প্রথমে ঘাঁটি গাড়েন বাংলার হুগলী বন্দরে, তারপর সুন্দরবন অঞ্চলে। ভারতবর্ষের বুকে তখন পর্তুগীজরা জলদস্যুগিরিতে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। এখানে একদল দুর্দান্ত স্বভাবের পর্তুগীজ জলদস্যুর পাল্লায় পড়ে তিনি নিজেও জলদস্যুগিরি শুরু করেন এবং এখানে দাস ব্যবসা করে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করেন। কিন্তু কোনো কারণে কয়েক বছর বাদে হঠাৎ সুন্দরবনের ঘাঁটি ছেড়ে পেদ্রো রিকার্দো নিজের দেশ পর্তুগালে ফিরে আসেন এবং নতুন ভাবে জীবন শুরু করেন।

লুই জানান, তাঁর পূর্বপুরুষ নিজের জীবনের এই সব ঘটনার কাথাই শুধু তাঁর সেই ডায়রিতে লিখে রেখে যাননি, এই সঙ্গে রেখে গেছেন একটা ম্যাপ। সেই ম্যাপে আছে সুন্দরবনের সেই পর্তুগীজ ঘাঁটিতে পৌছোবার সঠিক পথনির্দেশ। লুই-এর ধারণা সেই ঘাঁটির মধ্যে আজও আছে গুপ্ত ধনভাণ্ডার।
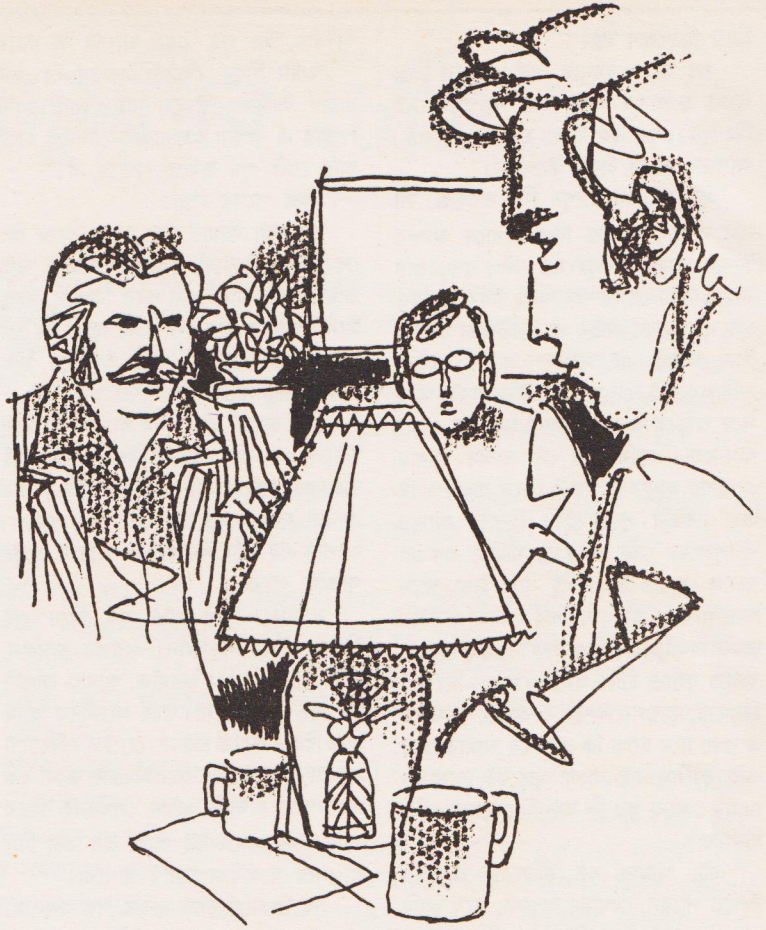
আপনি জানলেন কি করে?

সব শুনে মেঘনাদ প্রশ্ন করেছে, কিন্তু ডায়রি আর ম্যাপটা কি আপনি সঙ্গে এনেছেন?

নাঃ! এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন লুই, তারপর বলেছেন, সেটা চুরি হয়ে গেছে। আর যে চুরি করেছে, সে অন্য কেউ নয়, আমারই ছোট ভাই ফ্রান্সিস।

আপনার ভাই! বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

হ্যাঁ মিঃ সেন। লুই রিকার্দো আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, আমার ছোট ভাই ফ্রান্সিসই বোধকরি আমাদের পূর্বপুরুষ হার্মাদ পেদ্রো রিকার্দোর রক্তের ধারাটা বজায় রেখেছে। তাহলে তার কথাটাও বলি শুনুন। সেও এক লজ্জার কাহিনী।

অভিযানের প্রস্তুতি

লুই বলছিলেন তাঁর ছোট ভাই ফ্রান্সিসের কীর্তিকাহিনী।

ছেলেবেলা থেকেই ফ্রান্সিস ছিল দুর্দান্ত এবং নিষ্ঠুর স্বভাবের। তার নিত্যনতুন দুষ্কর্ম এলাকার মানুষজনকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছিল। সেই কারণে লুইয়ের বাবা এদোয়ার্দ রিকার্দো ফ্রান্সিসকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করে তাঁর সব সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর ফ্রান্সিস তার দাদা লুইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে। দাদার কাছে সে খুব কান্নাকাটি করে আশ্রয় চায়। তখন তার খুবই খারাপ অবস্থা। চাকরি-বাকরি নেই। প্রায় না খেয়ে দিন চলছে। লুই ভাইয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে বাড়িতে আশ্রয় না দিয়ে পারেননি। আর এরই সুযোগ নেয় ফ্রান্সিস। সে জানতে পারে তার পূর্বপুরুষের ডায়রি এবং নক্সার কথা। লুই লিসবন ছেড়ে ভারতবর্ষে আসার ঠিক আগের দিন ফ্রান্সিস পুরনো দেরাজ থেকে ডায়রি এবং ম্যাপটা

নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়।

সব শুনে মেঘনাদ বলে, আমার কিন্তু ধারণা ফ্রান্সিসও এখন আর পর্তুগালে নেই মিঃ লুই। সেও এই বাংলা মুলুকেই এসেছে। আপনার মতো একই উদ্দেশ্যে।

লুই বললেন, দেখুন মিঃ ভরদ্বাজ, তা যদি বলেন, আমার কিন্তু এখানে আসার উদ্দেশ্য আমার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার উদ্ধার নয়। সে সম্পদ আমি নিয়ে যেতেও চাই না। কারণ আইন বা নৈতিকতা কোনো দিক থেকেই এই সম্পদে আমার কোনো অধিকার নেই। সে সম্পদ এই দেশেরই। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এদেশের মানুষের কান্না-ঘাম-রক্ত। আমি চাই সে সম্পদ আবার এদেশের মানুষের কাছেই ফিরে যাক। আমি শুধু একজন পুরাতত্ত্ববিদ হিসাবে আমার পূর্বপুরুষের সেই কলঙ্কময় ঘাঁটিটা একবার স্বচক্ষে দেখতে চাই। এই সঙ্গে ইচ্ছা আছে চারশো বছর আগে বাংলার হার্মাদদের নিয়ে একটা তথ্যমূলক ঐতিহাসিক নিবন্ধ লেখার..., বলতে বলতে হঠাৎ থমকে গেলেন মিঃ লুই রিকার্দো, তারপর বললেন, আচ্ছা, আপনার এ কথা মনে হলো কি করে যে আমার ছোট ভাই ফ্রান্সিস এই বাংলা মুলুকেই এসেছে? তেমন কোনো সূত্র কি আপনি পেয়েছেন মিঃ ভরদ্বাজ?

এটা আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি বলতে পারেন, মেঘনাদ বললো, তবে আমি দেখেছি আমার অনুভূতি কখনও মিথ্যে বলে না।

এবার আর আমি থাকতে পারলাম না। বললাম, মিঃ লুই, এখন আপনি কী চান?

আমি নিজে একবার সুন্দরবনের সেই হার্মাদ ঘাঁটিতে পৌঁছতে চাই। আমি জানি আমার এ বাসনা রহস্যভেদী মেঘনাদ ছাড়া অন্য কেউ পূর্ণ করতে পারবে না।

কিন্তু পথের নক্সা?

সে নক্সা আমার মনে আঁকা আছে মিঃ সেন, লুই রিকার্দো বললেন, আমার ভাই ডায়রি এবং ম্যাপ চুরি করে নিয়েছে, কিন্তু মনের গভীরে যে ম্যাপ আঁকা আছে তা তো মুছে দিতে পারেনি। তাই অসুবিধে হবে ঠিকই, তবু সঠিক পথনির্দেশ যদি পাই...

ঠিক আছে। হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো মেঘনাদ, তারপর বললো, মিঃ লুই আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী। আগামী বুধবার আমরা সুন্দরবনের উদ্দেশে যাত্রা করবো। আপনি এই কটা দিন আমার অতিথি হয়েই থাকতে পারেন।

ধন্যবাদ। খুশি খুশি মুখ নিয়ে লুই রিকার্দো উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, আমি জানতাম মিঃ ভরদ্বাজ, আমায় আপনি ফেরাতে পারবেন না। তবে আপনাকে আমি আর বিরক্ত করতে চাই না। হোটেল ওরিয়েন্টে আমার স্যুইট আরও কয়েকদিনের জন্যে বুক করা আছে। আমি এখন সেখানেই ফিরে যাচ্ছি। সেখান থেকেই আমি এই কটা দিন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো।

লুই রিকার্দো চলে যাবার পর বললাম, আচ্ছা মেঘনাদ, সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে না?

মেঘনাদ বললো, যত অদ্ভুতই মনে হোক, আমি কিন্তু সব মিলিয়ে এক রোমাঞ্চকর অভিযানের গন্ধ পাচ্ছি। রক্তে আমার মাদল বাজতে শুরু করেছে বন্ধু। এবার যে অভিযানে আমরা যাব, সেখানে জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ আর গাছের ডালে ডালে বিষাক্ত সাপের ফোঁসফোঁসানি।

আর জলদস্যুদের কথা বললি না?

ঠিক বলেছিস অর্ণব। হার্মাদরা সত্যি সত্যি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হারিয়ে যায়নি। আজও তারা আছে অন্য চেহারায়, অন্য রূপে—বলতে বলতে মেঘনাদ বললো, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস অর্ণব। এক্ষুণি একবার ফোন করতে হবে।

কাকে?

প্রসেনজিৎ মজুমদারকে তোর মনে পড়ে?

প্রসেনজিৎ মজুমদার। ভাবতে গিয়েই মনে পড়লো, তোর বন্ধু মৌবনির সেই ফরেস্ট রেঞ্জার? বেশ কয়েক বছর আগে একবার যার ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা গিয়েছিলাম 'সাহেব বাংলোর ভূত' রহস্যের সমাধান করতে?

ঠিক বলেছিস। কিছুদিন হলো প্রসেনজিৎ সুন্দরবনের কোর এরিয়ার রেঞ্জার হিসেবে পোস্টিং পেয়েছে। ওর অফিস ক্যানিং-এ। ভালই হলো বুঝলি। এ ব্যাপারটায় হয়তো ওর সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

বলতে বলতে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালো মেঘনাদ।

(চলবে)

ছবি : সমীর সরকার

জলদস্যুর গুপ্তধন

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[চারশো বছর আগে সুন্দরবন অঞ্চলের কুখ্যাত জলদস্যু ছিল পেদ্রো রিকার্দো। দস্যুবৃত্তি করে প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয় সে। কিন্তু নিজের দেশ পর্তুগালে ফেরার সময় কিছুই পেদ্রো সঙ্গে নিয়ে যায়নি। সব সম্পদ সে সুন্দরবন অঞ্চলে এক গোপন জায়গায় রেখে যায়। পেদ্রোর ডায়েরি পড়ে সেই গুপ্তধনের কথা জানতে পেরে তার এক বংশধর লুই রিকার্দো আসে রহস্যভেদী মেঘনাদের কাছে। লুকনো ধনরত্ন খুঁজে বার করতে মেঘনাদের সাহায্য চায়। তবে এও জানায় গোপন জায়গার ম্যাপ আর ডায়েরি তার কাছে নেই। সেগুলো চুরি করে নিয়েছে তারই ছোট ভাই ফ্রান্সিস। লুইয়ের কথায় মেঘনাদ গভীর রহস্যের আভাস পায়। সে রাজী হয় তাকে সাহায্য করতে।]

সুন্দরবন ভয়ঙ্কর

মাতলার জল কেটে ছুটে চলেছে আমাদের ভটভটি। ভটভটির যাত্রী ছ'জন—আমি আর মেঘনাদ ছাড়া রয়েছেন আমাদের বিদেশী বন্ধু লুই রিকার্দো, মেঘনাদের বন্ধু সুন্দরবনের ফরেস্ট রেঞ্জার প্রসেনজিৎ মজুমদার এবং নৌকোর সারেং নগেন জানা আর তার এক কিশোর সঙ্গী।

নামে ভটভটি হলেও এই যন্ত্রচালিত নৌকোটি যে কোনো মোটর লঞ্চের চেয়ে গতিতে খুব একটা কম বলা যায় না। তবে এর বিরামহীন ভট্‌ভট্‌ শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়। অবশ্য অনেকটা সময় চলার ফলে শব্দটা কানে সয়ে এসেছে।

আমরা চলেছি কুলতলী ছাড়িয়ে মোহানার পথে দেউলপোতা গ্রামের উদ্দেশে। সেখানেই নাকি থাকে জুরান গুণিন। আপাতত তাকেই
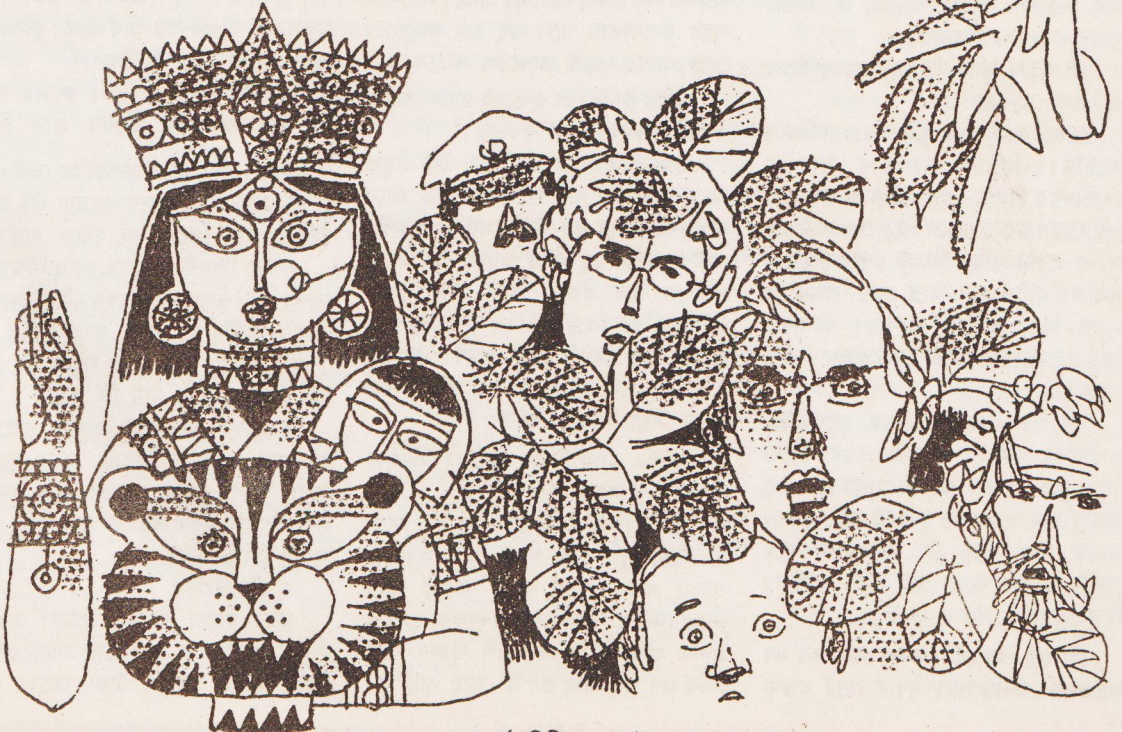
আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার।

জুরান গুণিনকে কেন দরকার সেটা বলার আগে আমাদের এ অভিযানের সলতে পাকানোর কথাটা বলা প্রয়োজন।

লুই রিকার্দো মেঘনাদের সাহায্য চাইলে মেঘনাদ সর্বপ্রথম ফোনে যোগাযোগ করেছে ওর বন্ধু প্রসেনজিতের সঙ্গে। সব কথা শুনে উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছেন তিনি।

এ ব্যাপারে প্রসেনজিৎবাবুর কাছ থেকেও যে তথ্য পাওয়া গেল তাও কম রোমাঞ্চকর নয়।

খবরটা হলো প্রায় মাসখানেক আগে এক বিদেশী সাহেব নাকি সুন্দরবন বেড়াতে যাবার নাম করে দেউলপোতা গ্রামের নামকরা গুণিন জুরান সর্দারকে নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে সুন্দরবনের নিষিদ্ধ কোর এরিয়ায় গিয়ে প্রবেশ করে। তারপর সেই সাহেবের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এ খবর অবশ্য আমরা আগেই জেনেছি। সেই সাহেব লুই রিকার্দোর ছোট ভাই ফ্রান্সিস যে লুই-এর কাছ থেকে তাদের পূর্বপুরুষের আঁকা নকশা হাতিয়ে আগেভাগেই এসে হাজির হয়েছে এখানে, তারপর সোজা পাড়ি দিয়েছে সুন্দরবনে তার পূর্বপুরুষের গুপ্তধন একাই হস্তগত করার অভিপ্রায়ে। কিন্তু সে সুন্দরবনে গিয়ে নিরুদ্দেশ হলো আর তার পথপ্রদর্শক জুরান গুণিন একা ফিরে এসে তার নিরুদ্দেশ সংবাদ জানাল, এ খবরটা কেমন যেন আশ্চর্যজনক।

হ্যাঁ, জুরান গুণিন গাঁয়ে এসে গ্রামবাসীদের এ কথাই বলেছে।

স্বাভাবিক কারণেই পুলিশ এ কথা বিশ্বাস করেনি। এমনকি এলাকার সাধারণ মানুষদেরও ধারণা—হয় গভীর জঙ্গলে ঢুকে সেই সাহেব বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে অথবা জুরান গুণিন নিজেই সেই সাহেবকে জঙ্গলের মধ্যে খুন করে তার গুপ্তধনের নকশা নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ব্যাপারটা নিয়ে দেউলপোতা গাঁয়ে বিরাট জল্পনা-কল্পনা চলছে।

সব শুনে মেঘনাদ বলেছে, প্রসেনজিৎ, ওখানকার সাধারণ মানুষের ধারণা মিথ্যে নাও হতে পারে। শুনেছি সুন্দরবনে শুধু ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমীরই নেই, ওখানে ডাঙায় আর জলে যে মানুষগুলো ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে কেউ কেউ জঙ্গলের হিংস্র পশুদের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

মিঃ লুই রিকার্দো এতক্ষণ আমাদের সব আলোচনা শুনছিলেন। এবার তিনি মন্তব্য করলেন, আমার ধারণা আমার ভাই ফ্রান্সিস জঙ্গলে পৌঁছে নিজেই লুকিয়ে পড়েছে, যাতে সেই গুণিনকে গুপ্তধনের ভাগ না দিতে হয়।

মেঘনাদ বলল—তার মানে আপনি বলছেন আপনার ভাই জুরান গুণিনের সাহায্য যতটুকু প্রয়োজন তা নিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, যাতে পুরো সম্পদটা সে একাই ভোগ করতে পারে, তাই তো?

হ্যাঁ মিঃ ভরদ্বাজ। আমার ভাই ফ্রান্সিস এমনই ভয়ানক এবং স্বার্থপর মানুষ। না হলে ভাবুন, আমি তার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাকে আশ্রয় দিলেও সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে গুপ্তধনের নকশা চুরি করে পালিয়ে আসতে পারে?

সব মিলিয়ে ফ্রান্সিস রিকার্দোর নিরুদ্দেশ হবার ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় সন্দেহ নেই।

এসব গতকালের কথাবার্তা। তার পর একটা দিন প্রসেনজিৎবাবুর সদর দপ্তর ক্যানিং-এ কাটিয়ে একটা ভাল ভটভটি আর নগেন জানার মতো এক দক্ষ সারেংকে নিয়ে আজ আমরা ভেসে পড়েছি দেউলপোতা গাঁয়ের উদ্দেশে।

দেউলপোতা মাতলা নদীর কিনারায় একটা ছোট্ট গ্রাম।

প্রসেনজিৎবাবু বলেছেন, দেখবেন অর্ণববাবু, ওখানে যে সব মানুষগুলো বাস করে তাদের দেখতে যেমনই হোক, এক একজন এক একটা রহস্যময় চরিত্র। আপনারা শহর কলকাতায় বসে এই সব মানুষদের বেঁচে থাকার লড়াই ভাবতেও পারবেন না।

জুরান গুণিন তো ওখানেই থাকে। আচ্ছা লোকটা কেমন? প্রশ্ন করলাম।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, সে এক অদ্ভুত মানুষ। তার যে কত বয়স তা কেউ জানে না। সুন্দরবনে যে সব মৌলে (মধু-সংগ্রহকারী) গভীর জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যায় অথবা খাঁড়িতে মাছ ধরতে যায়, তারা জুরান গুণিনকে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে নাকি মন্ত্র পড়ে বাঘের মুখ বেঁধে দিতে পারে। এমনকি বাঘের মুখ থেকে শিকারে ধরা হরিণ পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে আসতে পারে।

আপনি এসব বিশ্বাস করেন? জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না অর্ণববাবু! তবে যখন দেখি সরকারী তরফে বাঘ গণনার কাজে যাবার সময় জঙ্গলরক্ষকরা নিজেদের বন্দুকের চেয়েও জুরান গুণিনের ওপর বেশি ভরসা করে তখন ওর গুণপনার গুণ না গেয়ে পারি না।

লোকটাকে দেখতে কেমন?

দেখতে? প্রসেনজিৎ মজুমদার হেসে বললেন, যদি ভেবে থাকেন সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে যে বশ মানাতে পারে তার চেহারাটা বাঘের মতোই শক্তপোক্ত তাহলে ভুল করবেন। পাতলা কোলকুঁজো চেহারার বুড়ো। একটা চোখ কে জানে কিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। একটা হাতও কব্জি থেকে অকেজো। তবু তার ব্যাঘ্র প্রতাপ।

ভেরী ইন্টারেস্টিং। আমি তো লোকটার কথা যত শুনছি ততই তাকে দেখবার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে। মেঘনাদ বলল।

আমি জানি তুই এ কথাই বলবি। বলতে বলতে প্রসেনজিৎ মজুমদার হা হা করে হেসে উঠেছেন।

দেখতে দেখতে অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছি, সময়টা মার্চের প্রথম দিক। এ সময়ে প্রকৃতি বড় মনোরম। শহর কলকাতা থেকে দূরে সুন্দরবনের নদীপথে যেতে যেতে মনে হয় যেন এক অন্য পৃথিবীতে এসে পড়েছি। নদীর দু'ধারে বিস্তীর্ণ জঙ্গল। কোথাও জঙ্গলের ধারে নদীর কিনারায় হাঁ করে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে সুন্দরবনের জলের রাজা বিশাল কুমীর। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে এক একটা ছোট গ্রাম। গ্রাম না বলে গোটা কয়েক কাঁচা ঘর বলাই ভাল। ওই সব বাড়িগুলিতে বাস করে সুন্দরবনের মধু-সংগ্রহকারী মৌলে অথবা জেলেরা—ডাঙার বাঘ আর জলের কুমীরদের সঙ্গে তাদের নিত্য আত্মীয়তা।

ওরা কি করছে ওখানে? কানের পাশে মিঃ লুই রিকার্দোর কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকালাম। নদীর ধারে জনাকয়েক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আর তাদের মায়েরা হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে জাল পেতে মাছ ধরতে ব্যস্ত।

দৃশ্যটা বিদেশী মানুষের কাছে বিস্ময়কর সন্দেহ নেই, কারণ এই ভয়ঙ্কর নদীর কিনারায় যেখানে কুমীর বা কামট থাকা বিচিত্র নয় সেখানে এভাবে মাছ ধরার সাহস ওই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পায় কি করে?

সাহেবের মনোভাব বুঝতে পেরেছে আমাদের ভটভটির সারেং নগেন জানা। হেসে বলল, সাহেব, এতেই তুমি অবাক হলে? অবাক হবার এই তো সবে শুরু। ওরা বাওটা চিংড়ি ধরছে গো।

বাওটা চিংড়ি?

মানে বাগদা চিংড়ির পোনা। এরকম হাজার পোনা ধরে মহাজনের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে পঞ্চাশ টাকা পাবে। তাই

বাড়ির বউ-ঝি, ছেলে-মেয়ে সবাই এ কাজে নেমে পড়ে।

কিন্তু তার আগেই যদি নদীতে কুমীরে ধরে? লুই রিকার্দোর বিস্ময় বুঝি বাগ মানে না।

এবার হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে নগেন জানা। তারপর বলে, সাহেব আমরা সোঁদর-বনের মানুষ বাঘ আর কুমীরকে ভয় করলে আর বাঁচতে পারবো না। যতদিন তেনাদের হাত এড়িয়ে থাকতে পারি ততদিনই আমাদের জীবন।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, নগেন, তোকে সেই বাঘে ধরার গল্পটা শোনা না। সময়টাও কাটবে।

নগেন জানা একটু যেন লাজুক হেসে বলল, হুজুর, এ কি আর নতুন করে বলবার। সুন্দরবনের বাঘের হাতে চড়চাপড় খাবার অভিজ্ঞতা আমাদের মতো জেলে, মৌলদের মাঝে মধ্যেই হয়ে থাকে। তবে ওনাদের হাত থেকে বেঁচে ফেরাটা বাবা দক্ষিণ রায়ের কৃপা না হলে হয় না।

দক্ষিণ রায় বুঝলি তো অর্ণব, সুন্দরবনের বাঘেদের দেবতা, কানের কাছে মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শুনলাম।

ততক্ষণে নগেন জানা তার কাহিনী শুরু করেছে :

আজ্ঞে হুজুর এ প্রায় বছর পাঁচেক আগের কথা। হাতে টানা ডিঙিতে খাঁড়ির ভেতরে ঢুকেছিলাম আমরা চারজন। উদ্দেশ্য ছিল খাঁড়িতে নৌকো বেঁধে ডাঙায় উঠে মধু সংগ্রহ করবো। সেটা সুন্দরবনের মধু সংগ্রহের মাস। প্রতি বছরই এ সময়ে আমরা জঙ্গলে ঢুকি চাক ভেঙে মধু আনতে। সেদিনও তাই গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গীরা তখনও নৌকোয়। আমিই প্রথম জলে নেমে একটা নুয়েপড়া গাছের ডালে নৌকো বাঁধছি।

হঠাৎ কি বলবো হুজুর! একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। তাই খাঁড়ির কাছে ঝলসে ওঠা হলুদের আভাস বুঝতে পারিনি। বুঝতে যখন পারলাম সেই মুহূর্তে থাবাটা এসে ছুঁয়েছে পিঠের ওপর।

বলবো কি হুজুর, বাবা দক্ষিণ রায়ের মানত করে বেরুবার পুণ্যতেই বোধহয় নিজের শরীরটা নিমেষে ছুঁড়ে দিতে পারলাম জলের ভেতরে। যাকে বলে এক ডুবে খাঁড়ির একেবারে তলায়। তারপর ডুব সাঁতার দিয়ে একেবারে অন্য দিকে। ততক্ষণে মাথার ওপরে ঘোলা জলে বাঘ তোলপাড় করতে লেগেছে। কতক্ষণ যে চুপটি করে জলের নিচে পড়েছিলাম হুজুর তা বলতে পারবো না। তবে ফুসফুসের শেষ দমটা ছাড়ার আগে ভেসে উঠেছিলাম। উঠে দেখলাম বাঘও নেই, আমার নৌকোও নেই। বাঘের থাবা পিঠে যেখানে বসেছিল সেখান দিয়ে তখন দরদর করে রক্ত পড়তে লেগেছে।

ওই অবস্থায় প্রাণপণে হাঁক দিতে সঙ্গীরা দূর থেকে ফিরে এসে আমায় উদ্ধার করল। ওরা তো ভেবেছিল হুজুর, আমি বাঘের কবলেই গেছি। নেহাৎ বনবিবি আর বাবা দক্ষিণ রায়ের কৃপা। হুজুর, বহুদিন চিকিৎসা করতে হয়েছিল...বলতে বলতে পিঠের দিকের জামাটা তুলে নগেন জানা বলল, দেখুন না হুজুর, এখনও সোঁদরবনের রাজা আমার পিঠের ওপর তার ছাপ রেখে দিয়েছে।

বেশ কৌতূহলী হয়েই নগেন জানার পিঠের দিকে নজর করলাম। সত্যি বটে, এখনও ওর পিঠে কাঁকড়ার গর্তের মতো ফুটোফাটা দাগ আর আঁচড়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

আমাদের পর্তুগীজ অতিথিকেও এর মধ্যে মেঘনাদ ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়েছে। তিনিও উঁকি মেরে দেখেছেন সুন্দরবন রাজ্যে মানুষপ্রজার পিঠে রয়াল বেঙ্গলের থাবার স্বাক্ষর। দেখে শুধু একটা মন্তব্যই করেছেন, হাউ হরবল।

মেঘনাদ হেসে বলেছে, মিঃ লুই, ভেবে দেখুন, চারশো বছর আগে এই রয়াল বেঙ্গলের সঙ্গে আপনার পূর্বপুরুষকেও মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

প্রসেনজিৎ এর সঙ্গে যোগ করল, শুধু মোকাবিলা নয়, তাদের রাজ্যের মধ্যেই হার্মাদরা ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। তার মানে তারাও এই রয়াল বেঙ্গলদের চেয়ে কোনো অংশে কম ভয়ঙ্কর ছিল না। বলতে বলতে উনি হঠাৎ ভটভটিতে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়তে শুরু করেছেন, এদিকে.....এই যে আমি.........ইন্সপেক্টর খাঁড়া....।

ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি দূর থেকে একটা মোটর বোট এগিয়ে আসছে। পুলিশ বোট।

মোটর বোটে বসে একজন পুলিশ অফিসার আর জনা কয়েক সশস্ত্র পুলিশ। অফিসার ভদ্রলোকের দশাসই চেহারা। রোদে পোড়া শরীর। নাকের নিচে এক বিরাট পুরুষ্টু গোঁফ। ওই গোঁফই যেন ভদ্রলোকের প্রতাপ জাহির করছে।

ততক্ষণে ওঁর দৃষ্টিও প্রসেনজিৎবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তিনিও ওদিক থেকে হাঁক দিলেন, আরে প্রসেনজিৎবাবু! কোথায় চললেন?

দেউলপোতায়। প্রসেনজিৎ মজুমদার এ তরফ থেকে হাঁক ছাড়লেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

আমি আসছি আরও দক্ষিণ থেকে। তবে আমিও এখন দেউলপোতায় যাব। ইন্সপেক্টর খাঁড়া মোটর বোট থেকে বললেন, খবর পেয়েছি একটা লোক ওখানে মরেছে। আনন্যাচারাল ডেথ।

ততক্ষণে মোটর বোট আমাদের ভটভটির অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে। সেটা একেবারে পাশে এসে পৌঁছোতেই পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক তাঁর মোটর বোট ছেড়ে আমাদের ভটভটিতে উঠে এলেন, তারপর বললেন, আর বলবেন না প্রসেনজিৎবাবু, কথা নেই বার্তা নেই সেই ব্যাটা গুনিন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

গুনিন! মানে সেই জুরান গুনিন। যে নাকি এক সাহেবকে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ফেলে পালিয়ে এসেছে? এবার পাশ থেকে মেঘনাদ প্রশ্নটা করল।

আরে হ্যাঁ মশাই, সেই বটে। ব্যাটা গুনিন তো নয় একটা আস্ত ডাকাত। তবে কথায় বলে না অতি চালাকের গলায় দড়ি! ও ব্যাটারও হয়েছে তাই......বলতে বলতে ইন্সপেক্টর খাঁড়া হঠাৎ থমকে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে কিছুটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বললেন, কিন্তু আপনি.....মানে আপনাকে তো ঠিক.... বলতে বলতে ওঁর দৃষ্টি মেঘনাদ, মিঃ লুই রিকার্দো এবং আমার ওপর ঘোরাফেরা করতে লাগল।

অগত্যা প্রসেনজিৎবাবু সংক্ষেপে আমাদের পরিচয় এবং এখানে আগমনের উদ্দেশ্য বলে দিলেন। শুনতে শুনতে ওঁর মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিরাট পুরুষ্টু গোঁফ জোড়া ঘন ঘন নাড়তে নাড়তে বললেন, বটে! বটে! এ তো মশাই মেঘ না চাইতেই 'মেঘনাদ'....বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামলে বললেন, আমাকে আপনি না চিনলেও আমায় আপনার একজন ফ্যান বলতে পারেন মেঘনাদবাবু। অনেকদিন যাবৎই ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে কাজ করার। এতদিনে বোধহয় সে সুযোগ এল।

আত্মপ্রশংসা শুনতে মেঘনাদ কোনো দিনই পছন্দ করে না, তাই বোধ হয় প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্যে বলল, তা এদিকে এসেছিলেন কি জুরান গুনিনের মৃত্যুর খবরটা শুনেই?

আরে না মশাই। বেরিয়েছিলাম টহল-দারিতে। একটু দক্ষিণে নেমেছিলাম। হঠাৎ

Suk—Mar-4

খবর পেলাম বাংলাদেশ থেকে বোম্বেটেদের একটা মোটর বোট আমাদের এরিয়ায় ঢুকে একটা জেলে নৌকো দখল করে বাংলাদেশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শুনেই পিছু ধাওয়া করলাম।

পেলেন তাদের?

যাবে কোথায়? ইন্সপেক্টর অনন্তদেব খাঁড়া তাঁর পুরুষ্টু গোঁফটা একবার চুমরে নিয়ে বললেন, তখনও বেশিদূর পালাতে পারেনি। পিছু ধাওয়া করতেই তারা গোলা-গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। ভাবুন কী সাহস! তবে পুলিশের সঙ্গে পারবে কেন? শেষ পর্যন্ত জেলে নৌকো আর জেলেদের ছেড়ে ব্যাটারা পালিয়ে বাঁচল। বলতে বলতে আত্মগর্বে হা হা শব্দে হেসে উঠলেন ইন্সপেক্টর।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, এই সব এলাকায় এ এক নিত্য ঝঞ্ঝাট। এখানে ডাঙায় যেমন বাঘ তেমনি জলে কুমীর আর বোম্বেটে। বিশেষ করে নিরীহ জেলেদের কাছ থেকে নৌকোসুদ্ধ মাছ লুঠ করার জন্যে ওরা যখন তখন হামলা চালায় কিংবা ধরে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ আদায় করে।

এসব তথ্য অবশ্য আমরা এখানে আসার আগেই জেনেছি। এ এলাকার ত্রাস নাকি জটাই সর্দার। পুলিশও তার সঙ্গে পেরে ওঠে না। এমন জলদস্যু নাকি আরও আছে।

মেঘনাদ কিন্তু এ প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে বলল, তা জুরান গুণিনের গলায় দড়ি দেবার খবরটা কে দিল আপনাকে?

স্থানীয় এক জেলে। ইন্সপেক্টর খাঁড়া বললেন, বাংলাদেশী ডাকাত দলের সঙ্গে লড়াই করে ফিরছি, হঠাৎ একটা জেলে ডিঙি থেকে খবরটা পেলাম।

বলতে বলতে আমাদের ভটভটি দেউল-পোতার ঘাটে এসে নোঙর করল।

আত্মহত্যা?

দেউলপোতা নামেই গ্রাম।

ভটভটি থেকেই চোখে পড়ল গোটা কয়েক মাত্র কুঁড়েঘর।

আমাদের ভটভটি ডাঙায় ভিড়তেই সেখান থেকেই দেখতে পেলাম নদীর কিনারে একটা বড় ধোন্দল গাছের নিচে স্থানীয় লোকজনের একটা ছোটখাট জটলা।

আমরা সেই গাছের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

আমাদের দেখে স্থানীয় লোকজন সরে দাঁড়াল। আর তারপরই চোখে পড়ল ধোন্দল গাছের একটা উঁচু ডাল থেকে ঝুলছে একটা দেহ।

মৃত ব্যক্তিটি বৃদ্ধ। পরনে শুধু একটি আটহাতি ধুতি। আদুড় গা। চেহারাটা শুকনো ক্ষয়া। দেহটার ঠিক নিচে মাটিতে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে চলেছে একটা বছর পঁচিশ বয়সী মেয়ে। তার চেহারাটাও শুকনো শুকনো। পরনে বিবর্ণ শাড়ি-ব্লাউজ, মাথার চুল যেন শণের নুড়ি।

মেঘনাদ জিগ্যেস করল, মেয়েটি কে?

জুরান গুণিনের নাতনি ফুলমণি। ওর আর কেউ নেই, দাদুর কাছেই থাকতো। পাশ থেকে বললেন ইন্সপেক্টর খাঁড়া।

লোকটা সত্যিই কী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে? মৃতদেহটা লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ বলল মেঘনাদ।

তার মানে? তুই কি বলতে চাইছিস মেঘনাদ? প্রসেনজিৎ মজুমদার পাশ থেকে জিগ্যেস করলেন।

আপাতত আমি এটাই বলতে চাইছি বন্ধু, যে এটা আত্মহত্যা নয়, খুন। এই লোকটাকে কোনো জায়গায় খুন করে তারপর ওর গলায় দড়ি বেঁধে এই গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কেন? আপনার এরকম মনে হওয়ার কারণটা কি আমি জানতে পারি মেঘনাদবাবু? ইন্সপেক্টর ভ্রূ কুঁচকে মেঘনাদের দিকে তাকালেন।

বলছি। তার আগে দেহটা গাছ থেকে নামাবার ব্যবস্থা করুন।

নিশ্চয়ই। বলেই ইন্সপেক্টর সঙ্গের দুজন কনস্টেবলকে হুকুম করলেন, এ্যাই লাশ মাটিতে নামা।

দেহ নামিয়ে গাছের নিচে শুইয়ে দেওয়া হলো।

মেঘনাদ বলল, এইবার দেখুন ইন্সপেক্টর খাঁড়া। লোকটা যদি সত্যি সত্যি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতো তবে শেষ মুহূর্তে ওর বাঁচার একটা প্রয়াস থাকতো। এটা জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই ওর পায়ের পাতা থাকতো নিম্নমুখী। অর্থাৎ মাটি স্পর্শ করার আকুলতা। এখানে কিন্তু তা নেই। এর একটাই অর্থ—মৃত্যুর কারণ গলায় দড়ি নয়। তাছাড়া দেখুন ওর গলাতেও দড়ির গিঁট একটা নয়—একাধিক। বলতে বলতে মেঘনাদ দেহটাকে উল্টে দিল। তারপর কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বলল, এই তো দেখুন মোক্ষম প্রমাণ। মাথার পেছন দিকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। লোকটিকে অন্য কোথাও পেছন থেকে মাথায় আঘাত করে খুন করা হয়েছে, তারপর বডি এখানে এনে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মেঘনাদ আরও কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু সেটা আর বলতে দিলেন না, ইন্সপেক্টর তার আগেই হৈ হৈ করে বলে উঠলেন, মেঘনাদবাবু, এতকাল আপনার ইনভেস্টি-গেশনের গল্প দূর থেকে শুনেছি। এখন ছোট্ট একটা নমুনা চোখের সামনে দেখলাম। আমি মুগ্ধ। এবার বলুন, কেসটাকে নিয়ে কি করা যায়?

যেটা সবচেয়ে আগে করা দরকার তা নিশ্চয়ই খুনের মোটিভটা বার করা—কে বা কারা কোন উদ্দেশ্যে জুরান গুণিনকে খুন করেছে, তাই তো মেঘনাদ? মেঘনাদ কিছু বলার আগে প্রসেনজিৎবাবুই কথাটা বললেন।

মেঘনাদ কিন্তু প্রসেনজিতের কথায় কোনো উত্তর দিল না। ওর তখন নজর পড়েছে ফুলমণির দিকে। ওর সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, তুমি তো ফুলমণি?

একজন অপরিচিত মানুষ এসে হঠাৎ এভাবে প্রশ্ন করায় ফুলমণি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। তার কান্না থেমে গেল। ভয়ে ভয়ে বলল, হ্যাঁ হুজুর।

জুরান গুণিন তোমার দাদু, তাই না? আবার প্রশ্ন করল মেঘনাদ।

হ্যাঁ হুজুর, দাদু ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর কেউ ছিল না গো। বলতে বলতে ফুলমণি আবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

কাল রাতে তোমার দাদুকে শেষবারের মতো কখন দেখেছিলে মনে আছে?

আমাদের তো হুজুর অত ঘড়ি দেখে চলার ক্ষেমতা নেই, তবে সেসময়ে চাঁদটা মাথার ওপরে উঠে পড়েছিল। ফুলমণি বলতে শুরু করল, রোজকার মতো দাদু হাতের কুপিটা জ্বেলে বনবিবিতলায় রাতের পুজোটা সারতে গিয়েছিল। পুজো সেরে এক একদিন ফিরতে দাদুর বেশ রাত হয়। তাই দাদু বলে রেখেছে দেরি দেখলে আমি যেন দাদুর খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে খেয়ে শুয়ে পড়ি। গতকালও তাই করেছি। এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে গেছে হুজুর। আমায় কালঘুমে পেয়েছিল গো। তারপর সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি দাদুর খাবার যেমন রেখেছিলুম তেমনি ঢাকা রয়েছে। দাদু ঘরে ফেরেনি। তখন ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চারদিকে খুঁজতে খুঁজতে এই গাছতলায় এসে দেখি... বলতে বলতে আবার ডুকরে কেঁদে উঠল ফুলমণি।

ফুলমণি যখন এসব কথা বলছিল, মেঘনাদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর এ দৃষ্টি আমার চেনা, একটা মানুষের মনের ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নেয়।

ফুলমণির কথা শেষ হলে মেঘনাদ বলল—তোমার কী মনে হয় ফুলমণি, তোমার দাদু এভাবে আত্মহত্যা করতে পারে?

জানি না হুজুর, আমি কিচ্ছু জানি না। তবে দাদু আমায় এত ভালবাসতো। আমায় ছেড়ে দাদু আত্মহত্যা করবে—এ আমি ভাবতেও পারি না।

আমিও তাই বলি, মেঘনাদ ফুলমণির কথার পিঠে বলল, তোমার দাদু আত্মহত্যা করেনি। তাকে খুন করা হয়েছে। তুমি বলতে পার কে তোমার দাদুকে খুন করতে পারে?

এবার হঠাৎ চুপ করে গেল ফুলমণি। স্পষ্টই ওর দুচোখে ফুটে উঠল আতঙ্কের ছায়া। ও কেমন যেন ভয়ে ভয়ে আশপাশটা একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করল।

মেঘনাদ আর এ প্রসঙ্গে গেল না। হঠাৎ সে মৃতদেহটা পরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ইন্সপেক্টর খাঁড়াও আশপাশটা পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, মেঘনাদবাবু আপনি ঠিকই বলেছেন। বুড়োটাকে খুন করে যে এখানে টেনে আনা হয়েছে তার স্পষ্ট ছাপ মাটিতে রয়েছে। বলতে বলতে গাছের নিচে মাটির ওপর এক জায়গায় নির্দেশ করলেন ইন্সপেক্টর।

ওঁর কথা মতো তাকালাম।

গাছের নিচে কিছুটা অংশে মাটির ওপর থেকে ঘাস উঠে গেছে। ভাল করে লক্ষ্য করতে চোখে পড়ল জায়গাটায় কেমন যেন একটা লম্বা ঘষটানো দাগ। যেন ওই জায়গায় কোনো ভারী কিছু ঘষটে টেনে আনা হয়েছে। মেঘনাদ সঙ্গে সঙ্গে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করল।

ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, মেঘনাদ কী দেখছিস রে?

রক্তের ফোঁটা। বলতে বলতে মেঘনাদ সেই ধুলো মাটির ওপর দিয়ে সেই ঘষটানো দাগ বরাবর ম্যাগনিফাইং গ্লাসে চোখ রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

ইন্সপেক্টর খাঁড়া জিগ্যেস করলেন, মেঘনাদবাবু, দাগটা কি ওদিকেই গেছে?

না ইন্সপেক্টর। আপনি উল্টো বললেন। দাগটা এসেছে ওদিক থেকে। চলুন ওর শুরুটা কোথায় দেখে আসি। বলতে বলতে মেঘনাদ উঠে দাঁড়িয়ে প্রসেনজিৎবাবুকে বলল, প্রসেনজিৎ, তোর আর আমাদের সঙ্গে যাবার দরকার নেই। তুই বরং মিঃ রিকার্দোকে নিয়ে এখানেই অপেক্ষা কর। যতই হোক উনি আমাদের অতিথি। ওঁকে এসব ঝঞ্ঝাটে না জড়াতে পারলেই ভাল।

মেঘনাদের কথায় এবার মিঃ লুই-এর দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক মনে হলো সত্যিই এসব দেখে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন। প্রসেনজিৎ মেঘনাদের বক্তব্যটা জানাতে উনি একবার ঢোক গিলে মাথা নাড়লেন। কিন্তু তখনও তো জানি না মেঘনাদ আমাদের এই বিদেশী অতিথিটিকে কোনো ঝঞ্ঝাটে জড়াতে না চাইলেও খুব শিগগির এক ভয়ঙ্কর বিপদের মেঘ ওঁর দিকে ধেয়ে আসছে।

কিন্তু সে তো পরের কথা। আপাতত আমি আর ইন্সপেক্টর খাঁড়া মেঘনাদের পিছুপিছু এগিয়ে চললাম।

ইন্সপেক্টর মেঘনাদকে প্রায় গুঁড়ি মেরে মাটিতে মুখ নামিয়ে এগুতে দেখে আমার কানের কাছে মুখ এনে জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা অর্ণববাবু, আপনার বন্ধুটির কি ঘ্রাণশক্তিও আছে নাকি! মানে যেভাবে এগিয়ে চলেছেন...।

কথাটা মেঘনাদের কানে ঠিক পৌঁছে গেছে। ওই অবস্থাতেই চোখ না সরিয়ে বলল, আমার যে শক্তি আছে তা আপনার চেয়ে আলাদা কিছু নয় ইন্সপেক্টর। যেটা আমি প্রয়োগ করছি সেটা হলো পর্যবেক্ষণশক্তি।

এতক্ষণে আমরা গাছটা থেকে অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরে চলে এসেছি। এখান থেকে একটু দূরে একটা আটচালা মতো দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওটা কোনো দেবতার থান।

হঠাৎ একটা ঝোপের পেছনে গিয়ে মেঘনাদ থমকে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করে বলে উঠল, এই দেখুন ইন্সপেক্টর, খুনটা এখানেই হয়েছে।

ইন্সপেক্টর খাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নিচু হয়ে জায়গাটা লক্ষ্য করলাম, ওখানে ঝোপের কাছে মাটিতে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে।

মেঘনাদ বলল, ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো? গতকাল রাতে এই জায়গায় আততায়ীরা জুরান গুণিনকে খুন করে তারপর তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে গাছের ডালে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে, যাতে ব্যাপারটা আত্মহত্যা বলে মনে হয়।

হুঁ! ইন্সপেক্টর বললেন, এখানে যা কিছু বোঝার তা বোঝা তো হলো, এবার চলুন বাকি কাজগুলো সেরে ফেলা যাক।

বাকি কাজ বলতে? আমি জিগ্যেস করলাম।

বাকি কাজের প্রথমটা হলো লাশ পোস্টমর্টেমে পাঠানো, তারপর খুনীকে ধরা। বেশ পুলিশি মেজাজেই কথাটা বললেন ইন্সপেক্টর।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম ইন্সপেক্টরের কথার ভঙ্গিতে মেঘনাদের ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। মুখে বলল, হ্যাঁ, চলুন।

(চলবে)

ছবি ঃ সমীর সরকার

● জানা-অজানা

ডুবুরিদের ঘড়ির দাম ৬০ হাজার টাকা

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

একটি হাতঘড়ির মূল্য ৬০ হাজার টাকা। শুনলে অবাক লাগে বৈকি। তবু সত্যি। ভারতীয় নৌবাহিনীর ডুবুরিদের হাতে থাকে এই ঘড়ি। জলে নামার আগে ডুবুরিদের এই ঘড়ি পরতে হয়। জল-নিরোধক ঘড়িটি একাধিক কাজ করে। যেমন, ডুবুরি নদী বা সমুদ্রের কত ফুট নিচে আছেন, তা জানিয়ে দেবে ঘড়ি। ডুবুরি জলের ভেতর কোন দিকে আছেন, জলের চাপ কত, এমনকি আসন্ন বিপদ সম্পর্কেও ঘড়িটি নির্দেশ দেবে। নির্ভুল সময় ছাড়াও ঘোলা জলে ঘড়ির সমস্ত কিছু দেখা যাবে স্পষ্টভাবে। ভারতে দু'একটি কোম্পানি এই ঘড়ি বানায়। যে ঘড়ি এত কিছু নির্দেশ করে, সেই ঘড়ির দাম ৬০ হাজার টাকা তো হতেই পারে নিশ্চয়।

জলদস্যুর গুপ্তধন

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[জুরান গুণিন—এক সাহেবকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল। ফিরে এসেছিল একা। খবরটা বন্ধুর মুখে শুনে সুন্দরবনে পৌঁছেই মেঘনাদ সদলবলে চলে তার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু মাঝপথে পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছে খবর পায় গুণিন আত্মহত্যা করেছে। তদন্তে নেমে মেঘনাদ বোঝে ঘটনাটা আসলে হত্যা। খুনের জায়গাটাও সে দেখিয়ে দেয়। মেঘনাদের কথায় গুণিনের নাতনির চোখে-মুখে ফোটে আতঙ্কের ছায়া........]

জনপ্রতিনিধি

আমরা ফিরে চললাম। কিন্তু অকুস্থলে পৌঁছোবার আগেই দূর থেকে একটা প্রচণ্ড হাঁকডাক শুনলাম। আর একটু এগুতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল।

কালোকুলো চেহারার বছর পঞ্চাশ বয়সী একজন লোক। পরনে সাদা হাফশার্ট, ধুতি। আমাদের অতিথি মিঃ লুই রিকার্দোকে উনি উত্তেজিতভাবে কীসব বলবার চেষ্টা করছেন। উত্তরে মিঃ রিকার্দো শুধু নার্ভাসভাবে ঘন ঘন মাথা নাড়ছেন। প্রসেনজিৎবাবুও সেই আগন্তুক লোকটিকে কীসব বলবার চেষ্টা করছেন। সব মিলিয়ে ওখানে একটা বাগ্‌বিতণ্ডা চলছে। লক্ষ্য করলাম ওপাশে নদীর ঘাটে আর একটা ভটভটি এসে ভিড়েছে। সম্ভবত ওই ভটভটিতেই এই নতুন আগন্তুক জনাতিনেক সঙ্গীকে নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। সেই সঙ্গীদেরও দেখলাম। একজনের পরনে লুঙ্গি, নুর দাড়ি, গায়ে একটা চকরাবকরা লালসবুজ শার্ট। আরও দুজনও রয়েছে। স্থানীয় হলেও কাউকেই ভদ্রশ্রেণীর বলে মনে হলো না।

যুধিষ্ঠির মণ্ডল। শয়তান। সঙ্গে বদমাশ রসিদটাও রয়েছে। পাশ থেকে ইন্সপেক্টর খাঁড়ার কণ্ঠস্বর শুনলাম।
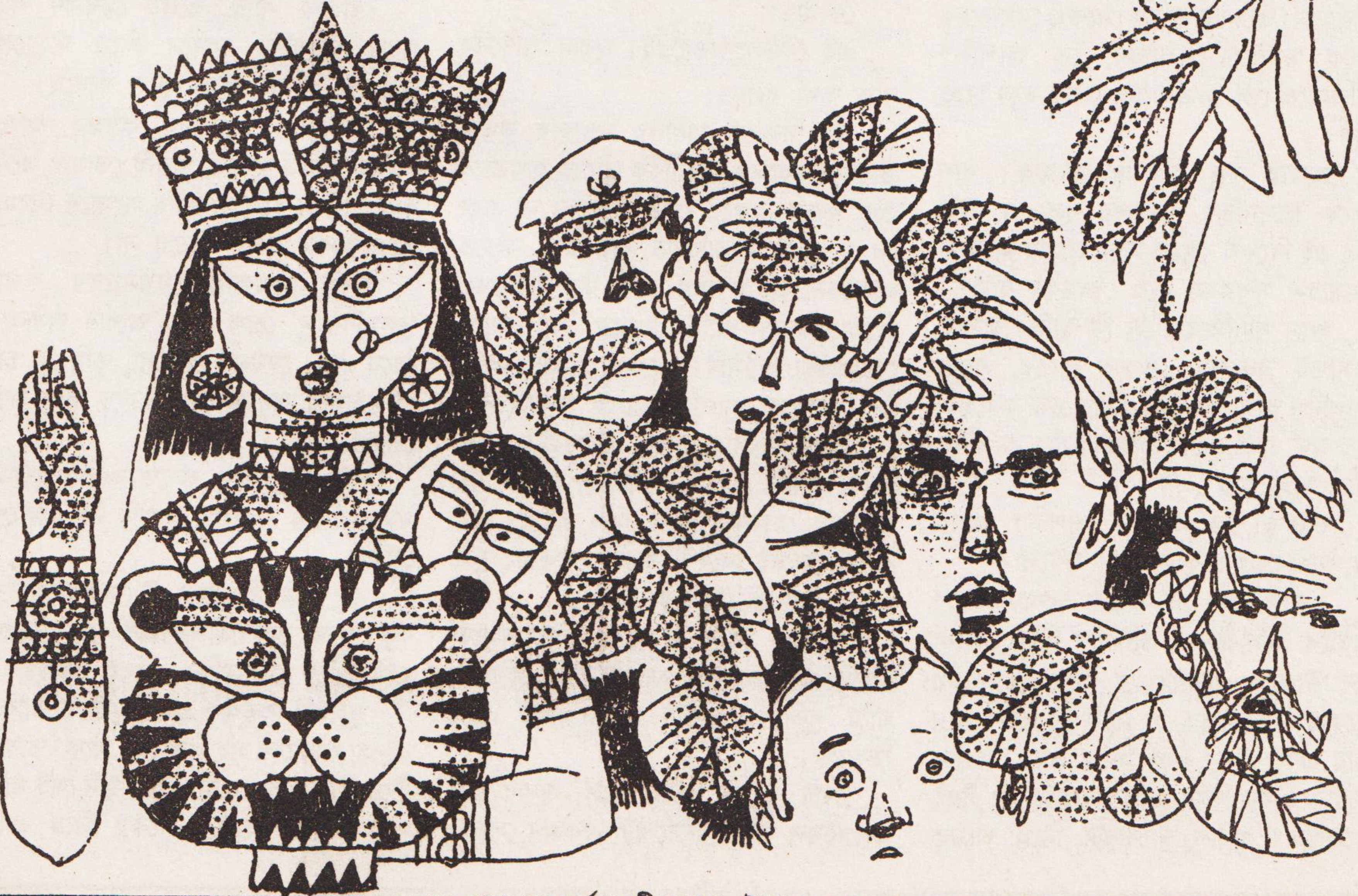
যুধিষ্ঠির মণ্ডল কে? মেঘনাদ প্রশ্ন করলো।

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা মশাই। এলাকায় খুব প্রতাপ। তবে কর্মের মধ্যে কুকর্মই বেশি। আর ওর যত কুকর্মের হাতিয়ার ওই নুলো রসিদ।

বলতে বলতে আমরা সেই ধোন্দলতলায় এসে হাজির হলাম।

ওখানে পৌঁছোতেই যুধিষ্ঠির মণ্ডল আমাদের অতিথিকে ছেড়ে ইন্সপেক্টর খাঁড়ার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এই যে দারোগা সাহেব, পাবলিকের পয়সায় চাকরি তো করছেন কিন্তু এলাকায় কোথায় কী হচ্ছে তার খবর রাখার দরকার বোধ করেন না?

ইন্সপেক্টর বোধকরি ওঁর কাছ থেকে এমন সম্বোধন শুনতে অভ্যস্ত তাই বিন্দুমাত্র উত্তপ্ত না হয়ে বললেন, আপনি কোন খবরের কথাটা বলছেন মণ্ডলবাবু?

অবাক করলেন যা হোক! যুধিষ্ঠির মণ্ডল আবার ঝাঁপিয়ে উঠলেন, গত একমাস যাবৎ এই সুন্দরবনে কী চলছে আপনি জানেন না? এই তো জুরান গুণিন গলায় দড়ি দিল। বুড়োটা যে এই কাজ করতে পারে তা কি আপনি আগে অনুমান করতে পারেননি?

মাফ করবেন, সেটা কি আপনি অনুমান করতে পেরেছিলেন?

যুধিষ্ঠির মণ্ডলের কথার মধ্যে মেঘনাদ হঠাৎ এ কথাটা বলতেই যুধিষ্ঠির এক ঝটকায় ফিরলেন। তারপর কয়েক সেকেন্ড মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কে আপনি? আপনাকে তো এ তল্লাটের লোক মনে হচ্ছে না?

আমার বন্ধু মেঘনাদ ভরদ্বাজ। পাশ থেকে প্রসেনজিৎ মজুমদার বললেন, উনি ওঁর এই বিদেশী বন্ধুকে নিয়ে আমার আতিথ্য নিয়েছেন সুন্দরবন ঘুরে দেখাবেন বলে।

শুনে যুধিষ্ঠিরের সে কি হাসি! হাসতে হাসতেই বললেন, রেঞ্জার সাহেব, এবার আপনিও আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছেন। এর অর্থ, এখানে যে চক্রান্তটা চলছে আপনিও তার সঙ্গে যুক্ত।

চক্রান্ত! কি বলছেন আপনি? এবার প্রসেনজিৎবাবুর কণ্ঠে উষ্মা ফুটলো।

চক্রান্ত নয়? এই সাহেব একমাস আগে এখানে এসে জুরান গুণিনকে নিয়ে কোনো বদ উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকেছিল। তারপর সে নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং গুণিন একা ফিরে আসে। অন্তত জুরান গুণিন ফিরে এসে সবাইকে সে গল্পই বলেছিল। পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা করলেও কোনো হদিস করতে পারেনি। কিন্তু আজ দেখছি সাহেব আবার ফিরে এসেছে আপনাদের সঙ্গে। আশ্চর্যের ব্যাপার ঠিক এই সময়েই গুণিনের লাশ পাওয়া গেল গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায়। সব ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্য এবং চক্রান্ত দেখা যাচ্ছে নাকি রেঞ্জার সাহেব?

আপনি ভুল করছেন যুধিষ্ঠিরবাবু। যে সাহেব জুরান গুণিনের সঙ্গে নিষিদ্ধ জঙ্গল এলাকায় ঢুকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন তিনি আর ইনি একই মানুষ নন। প্রসেনজিৎ মজুমদার বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, ইনি অবশ্য তাঁরই বড়ভাই। আসল লুই রিকার্দো।

অ্যাঁ! আসল লুই রিকার্দো! আবার বেদম হাসি হাসতে শুরু করেন যুধিষ্ঠির মণ্ডল। খেলাটা বেশ ভালই জমিয়েছেন মশাই।

দাঁড়ান যুধিষ্ঠিরবাবু। হঠাৎ মেঘনাদ ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো, আমি কি জানতে পারি, আপনিই বা কিভাবে নিশ্চিত হলেন ইনি সেই নিরুদ্দিষ্ট সাহেব? এর আগে কী আপনার সঙ্গে এঁর কোনোদিন পরিচয় হয়েছিল?

পরিচয়? না......মানে......ইয়ে......এবার কেমন যেন আমতা আমতা করতে শুরু করেন যুধিষ্ঠির। তারপর বলেন, অবশ্য ঠিক পরিচয় না হলেও নিজের চোখেই এঁকে দেখেছি।

কোথায়?

এই দেউলপোতাতেই। জুরান গুণিনের সঙ্গে কথা বলতে।

মিঃ রিকার্দো যুধিষ্ঠির মণ্ডলের কথার ভাষা না বুঝলেও স্বাভাবিক ভাবেই হাবভাবে তাঁর বক্তব্য বুঝতে দেরি করলেন না এবং সে কারণেই ইংরাজিতে বার বার বলতে লাগলেন, ইট'স অ্যা লাই মিঃ ভরদ্বাজ। মিথ্যে কথা। আমি এখানে এর আগে কোনোদিন আসিনি। এসেছে আমার ভাই। সে কথা তো আপনি আগেই জেনেছেন।

প্রসেনজিৎবাবু তখন ব্যাপারটা সহজ করার চেষ্টায় বললেন, আসলে হয়তো দুই ভাইয়ের চেহারায় খুবই মিল আছে। এর ওপর দুজনেই বিদেশী সাহেব। সুতরাং ভুল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

যুধিষ্ঠির মণ্ডল এরপরও কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ ওদিকের ঘাটে পুলিশের একটা মোটর বোট এসে ভিড়লো।

বোট থেকে নেমে এল জনাকয়েক কনস্টেবল আর মোটাসোটা একজন লোক। তাঁর কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা ক্যামেরা।

পুলিশের ক্যামেরাম্যান মিঃ হাজরা এসে পড়েছেন। লাশটাকে এবার পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে। ইন্সপেক্টর অনন্তদেব খাঁড়া যেন হাঁফ ছাড়লেন।

ব্যাপারটা তখনকার মতো চাপা পড়ে গেলেও একটা সন্দেহের কাঁটা কিন্তু আমার মনের মধ্যে থেকেই গেল—যুধিষ্ঠির মণ্ডল যে কথা বলতে চাইলো, তার পেছনে সত্যিই কী কোনো রহস্য আছে?

তখনও বুঝিনি রহস্যের মেঘ সবেমাত্র জমতে শুরু করেছে।

গুপ্তধনের নকশা

জুরান গুণিনের লাশ ইন্সপেক্টর খাঁড়া মোটর বোটে তুলে নিয়ে যাবার পর যুধিষ্ঠির মণ্ডল আরও কিছুক্ষণ হম্বিতম্বি করে অবশেষে চলে গেলেন। মেঘনাদ কিন্তু গেল না। ইন্সপেক্টর অবশ্য যাবার সময়ে মেঘনাদকে বলে গেছেন, মেঘনাদবাবু, আপনি যখন এখানে এসেই পড়েছেন, দেখুন না এ রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারেন কিনা। আমার কাছ থেকে সব রকম সাহায্য পাবেন, এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম।

ওরা চলে যাবার পর প্রসেনজিৎবাবু মেঘনাদকে বললেন, কিছু অনুমান করতে পারিস?

বোধহয় পারি, বলেই মেঘনাদ পায়ে পায়ে ফুলমণির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ফুলমণি তখনও ফুলে ফুলে কাঁদছে।

ফুলমণি! মেঘনাদের কণ্ঠস্বর আশ্চর্য কোমল, আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের কথা! গুণিন চলে যাওয়ায় সংসারে তোমার আর আপন কেউ রইলো না।

স্পষ্ট দেখলাম মেঘনাদের কথায় ফুলমণির দু' চোখ বেয়ে আবার অশ্রুধারা নেমে এল। মেঘনাদ বললো, তুমি কি চাও না তোমার দাদুকে যে মেরেছে তার শাস্তি হোক?

চাই, চাই হুজুর, বলতে বলতে ফুলমণি থমকে গিয়ে বললো, আপনি কি পুলিশের লোক?

না। আমি তোমাদের এই রেঞ্জার সাহেবের বন্ধু। আচ্ছা দেখ তো ফুলমণি, এই সাহেবকে তুমি আগে কোনোদিন দেখেছ কিনা?

ফুলমণি কিছুক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমাদের লুই রিকার্দোর দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, না হুজুর। ইনি সেই মানুষ নন। সেই সাহেবের নাকের নিচে একটা

না হুজুর। ইনি সেই মানুষ নন।

কালো জড়ুল ছিল। তবে চেহারাটা একই রকম।

ফুলমণি তাঁর সম্পর্কে কী বলছে লুই জানতে চাইলে প্রসেনজিৎবাবু তার বক্তব্যটা ইংরাজিতে তাঁকে জানালে লুই যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন মনে হলো। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললেন, ও ঠিকই বলেছে। আমার ছোট ভাই ফ্রান্সিসের নাকের নিচে একটা কালো জড়ুল আছে বটে।

মেঘনাদ সে কথায় কান না দিয়ে বললো, এবার বল তো তোমার দাদুকে কে মেরেছে?

চোখে তো দেখিনি হুজুর, তবে দাদুর ওপর অনেকেরই রাগ ছিল।

তারা কারা?

এই দেউলপোতার লোকজন। ওই মণ্ডলবাবু আর ডাকাত জটাই সর্দারের দল।

কিন্তু ফুলমণি, ওরা তোমার দাদুর পেছনে লেগেছিল একটাই কারণে, তা হলো তোমার দাদুর কাছে ছিল সুন্দরবনের সেই নিষিদ্ধ এলাকার নকশা। ওরা চেয়েছিল সেটা তোমার দাদুর কাছ থেকে কেড়ে নিতে, তাই না?

শুনে এবার চমকে উঠলো ফুলমণি। কয়েক মুহূর্ত অবাক চোখে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি জানেন হুজুর?

জানি ফুলমণি। আর এটাও জানি, ওরা কেউ সে নকশা উদ্ধার করতে পারেনি। আজও তা থেকে গেছে তোমার কাছে।

না, না হুজুর। ফুলমণি সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে শিউরে উঠে বললো, ওই সব্বোনেশে জিনিস আমি রাখিনি।

তবে সেটা কোথায়? মেঘনাদের কণ্ঠস্বরে যেন সাপ-খেলানো সুর।

জানি না হুজুর। ফুলমণির শরীরটা যেন কী এক আশঙ্কায় কাঁপতে শুরু করেছে, হুজুর, দাদুকে আমি বলেছিলাম, কী দরকার ওই নকশায়। ও তুমি দিয়ে দাও। দাদু বলেছে, না, ওরা লোভী, ও নকশা ওদের কারুর জন্যে নয়। তাই ও জিনিসে যার অধিকার আমি তার কাছে রেখে দিয়েছি। সুন্দরবনের রাজার কাছে।

সুন্দরবনের রাজার কাছে! মেঘনাদ কথাটা বিড়বিড় করলো, এটা একটা হেঁয়ালি। অর্ণব, তুই কিছু বুঝলি?

না।

লুই রিকার্দোও জানতে চাইলেন ফুলমণির বক্তব্য। মেঘনাদ ইংরাজি তর্জমা করে বলতে তিনিও কাঁধ ঝাঁকালেন, এর মানে কী!

মানেটা বুঝেছিলাম পরদিন সকালে।

তার আগে একটা রাতের মধ্যে ঘটে গেছে অনেকগুলো সাংঘাতিক ঘটনা।

দেউলপোতায় একদিন

কে জানে কেন ফুলমণি এরপর থেকে আমাদের সকলের ওপর খুব নির্ভর করেছিল। বোধহয় বিশ্বাসও করেছিল। তার একটা কারণ হতে পারে আমাদের মধ্যে ছিলেন অঞ্চলের রেঞ্জার সাহেব প্রসেনজিৎ মজুমদার। দেখলাম প্রসেনজিৎবাবুকে ও এলাকার মানুষজন সত্যিই খুব সম্মান করে। প্রসেনজিৎ-বাবুও ওদের খোঁজখবর নিয়মিত রাখেন। তাই প্রসেনজিৎবাবু যখন ফুলমণিকে মেঘনাদের ইচ্ছেটা জানালেন যে সে দিনটা আমরা ওই গাঁয়ে এবং তার কুঁড়েতেই থাকতে চাই, ফুলমণি দারুণ খুশি হলো।

সেদিনটা আমাদের দেউলপোতা গ্রামটা ঘুরেই কাটলো। সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাম দেখার অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনও হয়নি।

মেঘনাদের উদ্দেশ্য অবশ্য শুধু গ্রাম দেখাই ছিল না, ও চাইছিল জুরান গুণিনকে কে কোন উদ্দেশ্যে খুন করেছে তা খুঁজে বার করতে। এটা না জানতে পারলে বিপদ আমাদের পেছনে থেকেই যাবে।

গ্রাম অবশ্য নামেই। আসলে জঙ্গল কেটে গোটা কয়েক মাত্র কুঁড়ে। এখানে যারা থাকে তাদের বেশির ভাগেরই জীবিকা নদীতে বা দূর সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরা অথবা জঙ্গলে ঢুকে মধু সংগ্রহ। চাষের জমি সামান্য কিছু চোখে পড়লো। আর দেখতে পেলাম নানা ধরনের গাছ। শহুরে মানুষ আমি। খুব বেশি গাছ চিনি না। চিনিয়ে দেবার লোক অবশ্য সঙ্গে ছিল।

গাছপালার মধ্যে পাশুর, কেওড়া, গেঁওয়া কিংবা ধোন্দলই বেশি। নদীর ধারে গোলপাতা কিংবা উর্ধ্বমুখী শেকড়ওলা গাছও চোখে পড়লো। দিনটা এসব দেখেই কাটলো। এছাড়া আর একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল— গ্রামের

মন্দিরতলায় বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের মূর্তি।

আগেই শুনেছি সুন্দরবন অঞ্চলে এইসব দেব-দেবীর খুব প্রভাব। এখানে এসে তা স্বচক্ষে দেখলাম।

দেউলপোতা গ্রামে দেব-দেবীর প্রধান পুরোহিত নাকি ছিল জুরান গুণিন। এখানে সবাই বিশ্বাস করে বনবিবি আর দক্ষিণ রায়ের কাছ থেকে পাওয়া আশীর্বাদেই নাকি জুরান গুণিন অনেক অদ্ভুত ক্ষমতা অর্জন করেছিল। সুন্দরবনের বাঘ তার কথা শুনতো। এমনকি জীবজন্তুর ভাষাও নাকি বুঝতো জুরান। তবু তাকে এভাবে বেঘোরে মরতে হলো কেন, সেটাই আশ্চর্য!

মেঘনাদের অনুমান গুণিন খুন হয়েছে গুপ্তধনের নকশার জন্যেই। সে যে সেটা সাহেবের কাছ থেকে হস্তগত করেছে সে খবর আততায়ী কোনোভাবে জেনেছিল।

এখন প্রশ্ন একটাই—নকশাটা কি আততায়ী পেয়েছে? যদি না পেয়ে থাকে তবে সে নিশ্চয়ই আবার খোঁজ করতে আসবে। কারণ জলদস্যুর লুকিয়ে রাখা অঢেল ধনরত্নের চাবিকাঠি যে কোনো মানুষের কাছে লোভনীয়।

এদিকে ফুলমণিকে জুরান গুণিন বলেছে সে সেই নকশা নাকি রেখেছে সুন্দরবনের রাজার কাছে। সে রাজা কে? খুনী কী তাকে চিনতে পেরেছে? উদ্ধার করে নিয়ে গেছে নকশা? নাকি পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা?

এইসব কথাগুলোই শুধু সারাদিন আপন মনে ভেবে চলেছি। কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি।

বিকেলবেলা আমরা মন্দিরতলায় গেলাম বনবিবি আর দক্ষিণ রায়ের মূর্তি দেখতে।

মন্দির অবশ্য নামেই। আসলে একটা চালাঘর। তার মধ্যে পাশাপাশি দুটো ছোট মূর্তি।

প্রথমে বলি বনবিবির কথা। দেবীর বাহন বাঘ। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার। দেবীর পরনে শাড়ি। মাথায় মুকুট। এক হাতে কোলে তুলে নিয়েছেন একটি শিশুকে। দেবী সুন্দরবনের জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের শ্রদ্ধা এবং পুজো পান।

বনবিবির পাশেই অবস্থান দক্ষিণ রায়ের। ইনিও সুন্দরবন এলাকার খুবই জনপ্রিয় দেবতা। হিন্দু-মুসলমান সবাই মেনে চলে। দেবতাটি অত্যন্ত সুদর্শন। হাতে তীরধনুক, বাহন দেখলাম ঘোড়া।

মেঘনাদ সবকিছু খুঁটিয়ে দেখছিল। কিন্তু কোনো কথা বলছিল না। তবে আমাদের অতিথির মুখে বার বার তারিফ শুনছিলাম।

সব মিলিয়ে দেউলপোতা গাঁয়ে আমাদের সে দিনটা বেশ ভালই কাটলো। এদিন ভোরেই যে গাঁয়ের একজন খুন হয়েছে সে জন্যে কোনো উত্তেজনা আছে বলে মনে হলো না। এর দুটো কারণ হতে পারে—প্রথম, এসব জায়গায় এ ধরনের খুনখারাপি কোনো খবরই নয়। আর একটা কারণ হতে পারে, জুরান গুণিনের সাহেবকে গভীর জঙ্গলে একা ফেলে আসাটা এ গাঁয়ের মানুষ মোটেই ভাল চোখে দেখেনি। বিশ্বাসঘাতকতা বলেই মনে করেছে।

মেঘনাদ ফুলমণিকে বলেছিল আমাদের জন্যে তাকে আলাদা করে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না, কারণ সঙ্গে আমাদের শুকনো খাবার আছে। কিন্তু গাঁয়ের অন্য মানুষজন তাদের রেঞ্জার সাহেবের অতিথিদের না খাইয়ে ছাড়লো না। বলতে কি ভুবন ঘরামির ঘরে সেদিন আমাদের মধ্যাহ্নভোজনটা বেশ ভালই হলো—বনমোরগের ঝোল আর সুন্দরবনের ঢেঁকিছাঁটা মোটা চালের ভাত। পেটুক মেঘনাদ তো একাই আমাদের অর্ধেক ভাত সাবাড় করে দিল।

এ তো গেল আমাদের অভিজ্ঞতার একটা দিক। অন্যদিকে সেদিন রাতেই........

(চলবে)

ছবি : সমীর সরকার

জলদস্যুর গুপ্তধন

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[গুণিনের আত্মহত্যার তদন্তের মাঝেই দেউলপোতায় সাঙ্গোপাঙ্গ সহ আবির্ভাব স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা যুধিষ্ঠির মণ্ডলের। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন ওই এলাকায় একটা চক্রান্ত চলছে অথচ পুলিশ সে সম্পর্কে উদাসীন। সত্যিই কি তাই? এদিকে ফুলমণি মেঘনাদকে জানায় গুপ্তধনের নকশা আছে 'সুন্দরবনের রাজার কাছে'। এই রাজাটি কে? তদন্তের খাতিরে মেঘনাদ থেকে যায় দেউলপোতায়, আর সেদিন রাতেই......]

॥ আক্রমণ ॥

সন্ধ্যেটা সেদিন বেশ ভালভাবেই শুরু হয়েছিল। ফুলমণির প্রতিবেশী ভরত ঘরামি তার দাওয়ার সামনে একটা নৃত্যগীতের আসর বসিয়েছিল। রেঞ্জার সাহেবের সম্মানে সেখানে গাঁয়ের নারী পুরুষ নেচেছিল, গেয়েছিল। সে গান-নাচে ছিল স্থানীয় লোকসঙ্গীত আর লোকনৃত্যের ধারা। আমরা সবাই উপভোগ করেছিলাম। শুধু আমরাই বা কেন, আমাদের পর্তুগীজ বন্ধু লুই রিকার্দোও যে খুব মজা পাচ্ছিলেন তা তাঁর ঘন ঘন মাথা নাড়ানো আর তারিফসূচক শব্দপ্রয়োগ থেকেই বুঝতে পারছিলাম।

তবে আমাদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মেঘনাদ। সারাদিনই দেখতে পাচ্ছি ওর ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত। ওপর থেকে বোঝা না গেলেও ওর মনের ভাব দীর্ঘদিন ওর পাশে থেকে বুঝতে আমার অসুবিধে হচ্ছিল না।

ওর মনের মধ্যে কোনো চিন্তা পাক খেয়ে চলেছে। ও যেন কিছুটা উত্তেজিত। কিন্তু কেন? তা অবশ্য এখনও বুঝতে পারিনি। আমি জানি এ সময়ে ওকে প্রশ্ন করেও কোনো লাভ হয় না।

ইতিমধ্যে রাত বাড়ছে। উৎসব শেষে খাওয়া-দাওয়ার পালাও শেষ হলো। এরপর
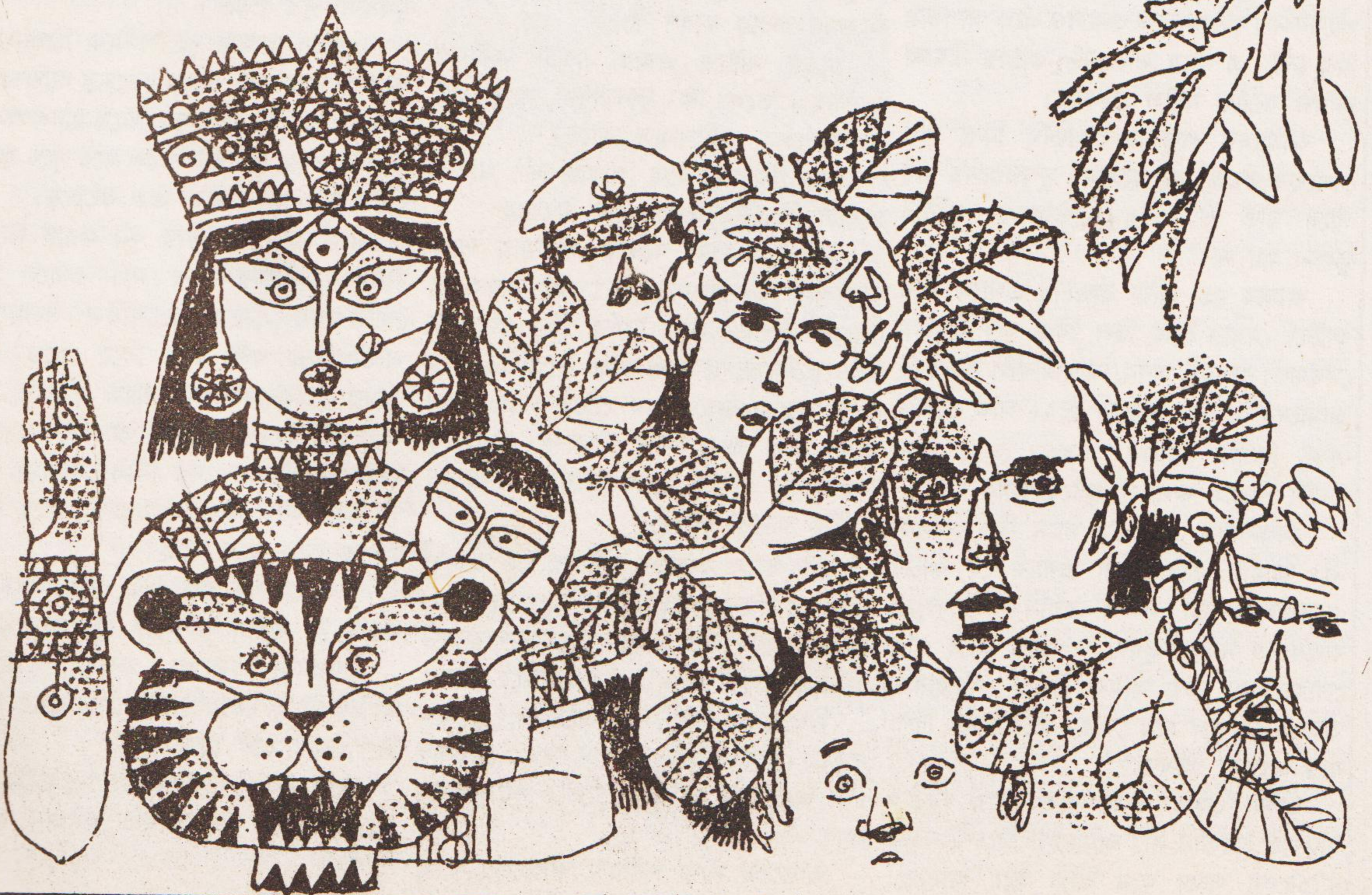
শোয়ার আয়োজন।

জুরান গুণিনের পাশাপাশি দুটো কুঁড়ে-ঘরের মধ্যে ফুলমণি আমাদের জন্য বড় ঘরটা ছেড়ে দিল। বড় ঘরে দুটো তক্তপোশ ছিল। ফুলমণি আরও দুটো দড়ির খাটিয়া এনে আমাদের চারজনের জন্য বিছানা করে দিল।

তবে শুতে বেশ রাত হলো। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা কুঁড়ের সামনে বসেছিলাম।

এখানে রাতের যে কী রূপ তা আমাদের মতো শহুরে মানুষরা কল্পনাও করতে পারবে না। মেঘহীন তারা-ফোটা কালো আকাশ। আকাশে চাঁদ নেই। নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে আছে চরাচর। দূরে দূরে শুধু দপদপ করছে জোনাকির আলো। দেউলপোতার পাশ দিয়ে বিশাল নদীটা বয়ে চলেছে নিঃশব্দে। অনেক দূরে মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে চলন্ত আলো। প্রসেনজিৎবাবু বললেন, ওরা জেলে। নৌকো নিয়ে বেরিয়েছে দূর সমুদ্রে মাছ ধরতে। মেঘনাদ বললো, জলদস্যুর নৌকোও তো হতে পারে প্রসেনজিৎ? প্রসেনজিৎবাবু অম্লান বদনে বললেন, অসম্ভব নয়।

অবশ্য রাত অনেক হলেও এখানকার রাত পুরোপুরি শব্দহীন নয়। নৈঃশব্দ্য ভেঙে দূর থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে নিশাচরদের হাঁকডাক। এমনকি বাঘের ডাকও কানে এল বার কয়েক।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, অর্ণববাবু, ভয় পাবেন না। বাঘের ডাক শুনলেও এতে আশঙ্কার কিছু নেই। এ গাঁয়ে বাঘ নেই। তাদের সীমানা আরও কয়েক মাইল ভেতরে।

আমাদের পর্তুগীজ অতিথি কিন্তু যত দেখছেন ততই মুগ্ধ হচ্ছেন। সুন্দরবনের এই গাঁয়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতার সত্যিই তুলনা হয় না।

আমার তো সারা রাতটাই এখানে বসে কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাদ সাধলো মেঘনাদ। বললো, অর্ণব, আগামীকাল সকালেই আমাদের এ গ্রাম ছাড়তে হবে। আজ রাতটা একটু বিশ্রাম দরকার। এরপর থেকে আর কতটা বিশ্রাম কপালে জুটবে জানি না।

মেঘনাদের এ কথার মানে ঠিক বুঝলাম না। আমার মনে হলো এখানে যে কাজে এসেছিলাম তা সফল হয়নি। জলদস্যুর গুপ্তধনের নকশা জুরান গুণিনের কাছে পাব ভেবেছিলাম, কিন্তু আমরা এখানে পৌঁছোবার আগেই সে খুন হয়ে গেছে। তবে কোন দিশা ধরে এগুবো আমরা?

এখন এসব কথা তুলে আর বিতর্ক বাড়াতে চাইলাম না। আমাদের বিদেশী বন্ধুর দু'চোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে আসছে। অতএব পরস্পরকে গুডনাইট জানিয়ে আমরা বিছানায় আশ্রয় নিলাম।

জুরান গুণিনের কুঁড়েঘরের খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমের অতলে তলিয়ে গিয়েছিলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম কে জানে! হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল চোখের ওপর তীব্র আলোর ফোকাসে। সেই সঙ্গে অনুভব করলাম কারা যেন আমায় চেপে ধরে শক্ত দড়ি দিয়ে খাটিয়ার সঙ্গে বাঁধছে। চিৎকার করতে চাইলাম, গলা থেকে স্বর বেরুলো না। মুখের মধ্যে কাপড় ঢুকিয়ে দিয়েছে।

একি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! এরা কারা?

চোখের ওপর এসে পড়েছে টর্চের তীব্র আলো। সে আলোয় আমার দৃষ্টি যেন ঝলসে গেছে। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। মেঘনাদ, প্রসেনজিৎ, লুই রিকার্দো—এদের কী অবস্থা?

কিছুই বুঝতে পারছি না।

কানের পাশে কতগুলো চাপা উত্তেজিত জড়িত কণ্ঠস্বর শুনলাম।

ওরা কারা? কেন এভাবে আমাদের আক্রমণ করেছে? ওরা কি আমাদের খুন করতে চায়?

ঘরের বাইরেও কিছু লোকের কথাবার্তা শুনলাম। এর অর্থ কিছু লোক দলবদ্ধভাবে আমাদের আক্রমণ করেছে। ওরা কী সুন্দরবনের আধুনিক জলদস্যু? কিন্তু আমাদের এভাবে আক্রমণ করার কারণ কী?

ঘরের বাইরে এবার একটা নারীকণ্ঠ শুনলাম। তবে কি ফুলমণির সঙ্গে ওই ডাকাতদলের যোগসাজস আছে?

আর চিন্তা করতে পারছি না। মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যে ওরা আমায় খাটিয়ার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। তারপরই লোকগুলো চোখের ওপর ফেলা টর্চের তীব্র আলোটা নিভিয়ে নিজেদের মধ্যে চাপা উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে বলতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ঘরের মধ্যে এখন কঠিন নৈঃশব্দ্য। যেন এক অন্ধকারের সমুদ্রে ডুবে রয়েছি। কোথাও এতটুকু আলো নেই।

এই ভাবে কতক্ষণ কাটলো কে জানে। হঠাৎ দূর থেকে ভটভটির আওয়াজ শুনলাম। এর মানে কী? যারা আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল তারা ভটভটি চড়েই ফিরে গেল?

কিন্তু ওরা এখানে কেন এসেছিল? আমায় এভাবে বেঁধে রেখেই বা গেল কেন? মেঘনাদ এবং অন্যদেরই বা কী করলো? খুন করেনি তো?

ভাবতেই সারা শরীরটা আতঙ্কের ঘামে ভিজে গেল। গলা থেকে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ জাগলো—আঃ......আঃ......আঃ......

কতক্ষণ এভাবে কাটলো জানি না। শরীরটা বোধহয় অসাড় হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অনুভব করলাম অন্ধকারের মধ্যে কেউ আমার বাঁধনটা খুলতে শুরু করেছে। গলা থেকে আমার ভয়ার্ত ঘড়ঘড়ে আওয়াজটা আবার বেরুতে লাগলো।

আর ঠিক তখনই ঘরের মধ্যে দপ করে একটা মোমবাতি জ্বলে উঠলো। তাকিয়ে দেখলাম প্রসেনজিৎ মজুমদার তাঁর গ্যাস-লাইটারটা থেকে একটা মোমবাতি জ্বাললেন।

আমার শরীরের বাঁধন খুলছে মেঘনাদ।

এরপর আমার মুখের ভেতর থেকে কাপড়ের গোলাটা বেরুতেই আমি আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলাম, মেঘনাদ, তোরা তাহলে বেঁচে আছিস?

হ্যাঁ। মেঘনাদ কিছু বলার আগেই প্রসেনজিৎ মজুমদার বললেন, তবে লুই রিকার্দোকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা বোধহয় তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

॥ হেঁয়ালি উদ্ধার ॥

আমি চমকে উঠে বললাম, সেকি! এর মানে কী?

মেঘনাদ কোনো কথা বললো না। মোমবাতির অল্প আলোতে দেখলাম ওর মুখখানা খুব গম্ভীর।

এরপর আমার দুই সঙ্গীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানলাম, ওদের দুজনের অভিজ্ঞতাও আমারই মতো। রাত্রে ঘুম ভেঙে হঠাৎ অনুভব করেছে, কারা শরীরটা চেপে ধরে মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বাঁধতে শুরু করেছে।

এর মানে আমাদের খুন করার উদ্দেশ্য আক্রমণকারীদের ছিল না। তাহলে ওরা খোঁজখবর নিয়ে এসেছিল আমাদের অতিথিটিকে বন্দী করে নিয়ে যেতে। আর ওদের সে কাজে আমরা যাতে বাধা না দিতে পারি তাই রাতের অন্ধকারে আচম্বিতে আক্রমণ করে আগেই আমাদের বেঁধে ফেলেছে ওরা।

ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের কাছে খুবই আশঙ্কাজনক মনে হচ্ছে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ওরা কারা? গতরাতে ওরাই কি জুরান গুণিনকে খুন করেছে?

মেঘনাদ বললো, অর্ণব, আমাদের অভিযানটা যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও জটিল রূপ নেবে মনে হচ্ছে।

সত্যি বলতে কি সেটা যে কত জটিল হতে পারে আমরা তা তখনও অনুমান করতে পারিনি।

ইতিমধ্যে অন্ধকার তরল হতে শুরু করেছে। আশপাশের গাছগাছালি থেকে শোনা যাচ্ছে পাখিদের কিচির-মিচির।

আমরা তিনজন কুঁড়ের বাইরে বেরিয়ে দাঁড়ালাম। আর তখনই চোখে পড়লো পাশের ছোট্ট কুঁড়েঘরটার সামনে মাটিতে কে একজন পড়ে রয়েছে। হাল্কা অন্ধকারের মধ্যে মানুষটাকে চেনা গেল না। আমরা ছুটে গেলাম। সেখানে পৌঁছেই থমকে দাঁড়ালাম।

কুঁড়েঘরের সামনে মাটির ওপর পড়ে রয়েছে ফুলমণি। কপালে জমাট বাঁধা কালচে রক্ত। চোখ দুটো বোজা। ফুলমণি কি চেতনাহীন না মৃত?

মেঘনাদ প্রথমে তার নাকের কাছে হাত রাখলো, বাঁ হাতের কব্জি তুলে নাড়ির গতি বোঝবার চেষ্টা করলো। এভাবে কয়েক সেকেন্ড পরীক্ষা করে বললো, না, প্রাণ আছে। নাড়ি চলছে। তবে খুবই ক্ষীণ।

দেখতে দেখতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল। আশপাশের ঘরের কয়েকজন মানুষও উঠে এল। ঘাটে বাঁধা আমাদের ভটভটির চালক নগেন জানাও এসে হাজির হলো। গতরাতটা সে আর তার সঙ্গী ভটভটিতেই কাটিয়েছে।

এব মধ্যে ফুলমণির জ্ঞান ফিরেছে। ওর ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগানো হয়েছে। ফাস্ট-এইড বক্স আমাদের সঙ্গেই ছিল।

জ্ঞান ফেরার পর ওর মুখে যা শুনলাম তাতে চিন্তা আমাদের আরও বাড়লো সন্দেহ নেই।

গত রাতে নাকি জটাই সর্দার আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল।

জটাই সর্দার! নামটা আমরা আগেই শুনেছি তবু তার নামটা উচ্চারিত হতেই স্থানীয় লোকজনের মধ্যে একটা ভয়ার্ত গুঞ্জন শুনতে পেলাম এবং ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো ফুলমণি।

ফুলমণি কাঁদতে কাঁদতে বললো, জটাই সর্দার একটা খুনে হুজুর। ওর মতো নিষ্ঠুর জলদস্যু এ তল্লাটে নেই। ওই খুন করেছে আমার দাদুকে। কালও এসেছিল আমাদের সবাইকে খুন করতে।

প্রসেনজিৎ বললেন, তাহলে আমাদের কাউকে খুন না করে শুধু বেঁধে রেখে চলে গেল কেন?

প্রসেনজিৎ আরও কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু ওঁকে বাধা দিয়ে মেঘনাদ বললো, প্রসেনজিৎ এখন এসব কথা থাক। চল আমরা ঘরের ভেতরে যাই।

বুঝলাম এতজনের মাঝখানে মেঘনাদ এ

প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চায় না।

ফুলমণিকে নিয়ে আমরা বড় ঘরটায় ঢুকলাম।

ওকে একটা খাটিয়ায় বসিয়ে মেঘনাদ বললো, ফুলমণি তুমি যদি গতকাল আমাদের কাছে সব সত্যি কথা বলতে তবে রাতে এ কাণ্ড ঘটতো না।

ফুলমণির দু'চোখে আবার জলের ধারা নামলো।

মেঘনাদ ফুলমণির সামনে বসে বললো, সত্যি করে বল তো ফুলমণি, জটাই সর্দারের দল গত রাতে কেন চড়াও হয়েছিল? সেই গুপ্তধনের নকশাটা তোমার কাছ থেকে আদায় করতে, তাই না?

ফুলমণি কোনো উত্তর দিল না। ওর চোখের জল আর বাধা মানছে না।

সে নকশা ওরা গত রাতে পেয়ে গেছে, তাই তো?

এইবার ফুলমণি মাথা নাড়লো। তারপর ধীরে ধীরে বললো, সে নকশার খোঁজ ওদের না দিলে ওরা গতরাতে আপনাদের সবাইকে খুন করতো হুজুর। আমাকেও ছাড়তো না।

তবে যে গতকাল তুমি বলেছিল নকশাটা তোমার কাছে নেই? জুরান গুনিন ওটা রেখেছে সুন্দরবনের রাজার কাছে? পাশ থেকে প্রশ্ন করলেন প্রসেনজিৎ মজুমদার।

আসলে এটা একটা ধাঁধা। তাই না ফুলমণি? ধাঁধার উত্তরটাও তুমি জানতে। মেঘনাদ বললো।

ফুলমণি নীরবে চোখের জল মুছলো। তারপর বললো, হুজুর, পরশু রাতে ওই জটাই সর্দারের দলই এসে দাদুকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তখন যদি দাদু ওদের হাতে নকশাটা তুলে দিত....জটাই সর্দার ভীষণ নিষ্ঠুর হুজুর....ও মানুষ নয় গো.....

জুরান গুনিনের হত্যারহস্যটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো, কিন্তু এখনও বোঝা যায়নি দুটো ব্যাপার। প্রথম কথা—ম্যাপটা তাহলে এখানে কোথায় ছিল? সুন্দরবনের রাজার কাছে কথাটার অর্থই বা কী? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, জটাই সর্দারের দল যদি গুপ্তধনের ম্যাপ হাতে পেয়েই থাকে তবে লুই রিকার্দোকে বন্দী করে নিয়ে গেল কেন?

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে মেঘনাদ বললো, হেঁয়ালিটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না অর্ণব। তবে তোর প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আমি গতকালই ভেবে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম আজ সকালেই জিনিসটা খুঁজে পাব, কিন্তু তার আগেই যা হবার তা হয়ে গেল।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, মেঘনাদ, এর মানে তুই জানিস জুরান গুণিন 'সুন্দরবনের রাজা' অর্থে কার কথা বুঝিয়েছে?

মেঘনাদ এ প্রসঙ্গে আর কিছু না বলে শুধু বললো, তোরা আয় আমার সঙ্গে। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবি।

আমরা মেঘনাদকে অনুসরণ করতে শুরু করলাম।

কিন্তু মেঘনাদ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ওদিকটা তো গাঁয়ের সেই মন্দিরতলা। ওখানেই আছে জুরান গুণিনের পূজ্য দেবতা বনবিবি আর দক্ষিণ রায়।

কিন্তু ওখানে এত গোলমাল কেন?

মন্দিরতলার কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম গাঁয়ের অনেকেই ভিড় করে রয়েছে। ওদের মধ্যে ভুবন ঘরামিও আছে।

ভুবন আমদের দেখে উত্তেজিত ভাবে এগিয়ে এল। তারপর বললো, দেখুন হুজুর কী কাণ্ড! কাল রাতে কারা এসে দেবতার মূর্তি ভেঙে দিয়ে গেছে।

মন্দিরে ঢুকে দেখলাম মূর্তি নয়, ভাঙা হয়েছে বনবিবির বাহন বাঘের মুখটা। কেউ যেন ভারী কিছুর সাহায্যে মাটির ব্যাঘ্রমূর্তির মুখটা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

কে এমন করলো? বনবিবির বাঘ বাহনের ওপর তার এমন আক্রোশেরই বা কারণ কী?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন এসব কথা ভাবছি, পাশ থেকে মেঘনাদের অস্ফুট স্বর শুনলাম, গত রাতেই যদি আসতাম তবে এভাবে আমাদের বোকা বনতে হতো না।

তুই কি বলতে চাইছিস মেঘনাদ? গত রাতে তুই যদি এখানে আসতিস তবে এই বাঘকে বাঁচাবার উপায় করতে পারতিস?

না অর্ণব। তা হয়তো পারতাম না। তবে সুন্দরবনের রাজার মুখ থেকে লুই রিকার্দোর পূর্বপুরুষের নকশাটা হয়তো উদ্ধার করতে পারতাম।

আমাদের কথাবার্তা এতক্ষণে প্রসেনজিৎবাবুর কানেও গেছে। উনি বললেন, তোর এ কথার অর্থ কি মেঘনাদ?

মেঘনাদ বললো, তবে শোন। ফুলমণিকে তার দাদু জুরান গুণিন বলেছিল, সে নকশা রেখেছে সুন্দরবনের রাজার কাছে। প্রথমে অর্থটা বুঝিনি। তারপর বনবিবির বাহনকে দেখে রাতে চিন্তা করতে করতে সম্ভাবনাটা মনে হলো। ভেবেছিলাম আজ ভোরে এসে হেঁয়ালির জট খুলবো। কিন্তু তার আগেই যা ঘটার ঘটে গেল।

তার মানে তুই বলছিস গত রাতে সেই নকশাটাও এখান থেকে হাতিয়ে নিয়ে গেছে জটাই সর্দার? কিন্তু হেঁয়ালির মানে সে জানলো কি করে?

ফুলমণিই বলেছে। মেঘনাদ গম্ভীর ভাবে বললো। আমার ধারণা ফুলমণি ওই হেঁয়ালির অর্থ জানতো আর গত রাতে সে জটাই সর্দারকে এর হদিস না দিলে জুরান গুণিনের মতো তাকে এবং আমাদের খুন হতে হতো।

কিন্তু নকশা যখন পেয়েই গেল, তখন লুই রিকার্দোকেও বন্দী করে নিয়ে গেল কেন?

কথাটা আমি বিড়বিড় করে বললেও প্রসেনজিৎবাবু ঠিক শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এটাও তো হতে পারে তাঁকে ওরা নদীতে নিয়ে গিয়ে খুন করে জলে ফেলে দিয়েছে, যাতে ওই গুপ্তধনের কোনো দাবিদার না থাকে।

হ্যাঁ, কথাটা সম্ভব। কিন্তু মেঘনাদের মুখ দেখে মনে হলো প্রসেনজিৎবাবুর এ মতামতটা ওর ঠিক মনঃপূত হলো না। ভ্রূ দুটো ওর কুঁচকেই রইলো।

ততক্ষণে ওদিকে আবার একটা হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে।

ইনসপেকটর অনন্তদেব খাঁড়া তাঁর দলবল নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। সঙ্গে সেই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা যুধিষ্ঠির মণ্ডল।

বোঝা গেল এবার এখানে শুরু হবে এক নতুন নাটক।

(চলবে)

ছবি : সমীর সরকার

জানো কী!

- ❑ আর সন্দেহ রইল না, আমি ভুল পথে চলেছি। আতঙ্কে সারা শরীর ভিজে চুপসে গেছে। কাঁপছি ঠকঠক করে। পা দুটো আর যেন চলতে চাইছে না। ঠিক এমন সময়ে নজরে পড়ল দূরে রাস্তার অপরপ্রান্তে......
- ❑ ভূতের রাজার সঙ্গে দুঃখীরাম, বিশ্ববরণ আর ভূতো মিঞা এসেছে চালাক রাজার দেশে। এদেশের কাণ্ড-কারখানা দেখে তো ওরা থ। রাজার বিরুদ্ধে কারো টুঁ শব্দ করার উপায় নেই। করলেই......
- ❑ খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে যেই ঠাকুমার দু-চোখ বুজে আসে অমনি বেরিয়ে পড়ে তুতুল। পর পর দু'দিন এই কাণ্ড। ঠাকুমা আর বাবা তুতুলের এই আচরণের মানে খুঁজে পান না। অথচ তুতুল বলে.......
- ❑ শশীভূষণের মনে হলো, পেছন থেকে কেউ যেন তার কাঁধে হাত রাখল। কে—বলে মুখ ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। যেই আবার সে তার ব্যাগ খোঁজার দিকে মন দিয়েছে অমনি তার অপর কাঁধে.....

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার আষাঢ় সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আরও অনেক অনেক কিছু যা তোমাদের মন ভরিয়ে দেবেই। হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল, বিচ্ছুরা তো আছেই।

জলদস্যুর গুপ্তধন

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[রাতের অন্ধকারে ভয়ঙ্কর সুন্দরবন আরো বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। আবির্ভাব ঘটে দস্যু জটাই সর্দারের। মেঘনাদদের মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে গুণিনের নাতনি ফুলমণির কাছ থেকে নকশার হদিস জেনে সেটা নিয়ে গা-ঢাকা দেয়। সঙ্গে নিয়ে যায় লুই রিকার্দকে। বাদ-বাকিদের বেঁধে রাখে। পরদিন সকালে গাঁয়ের মন্দিরে পাওয়া যায় বনবিবির বাহন বাঘের ভাঙা মূর্তি। এর মুখেই ছিল গুপ্তধনের নকশা।]

ভাঙাদুনি দ্বীপে একশো ঝুরি বট

সারা দিনটা খুবই হৈচৈ-এর মধ্যে কাটলো।

গতকাল এখানে গাঁয়ের গুণিন জুরান খুন হওয়ার পরও যা হয়নি আজ সকালে তা হয়েছে। সারা দেউলপোতা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। সে আতঙ্ক জটাই সর্দারের কথা ভেবে।

জটাই সর্দার সম্পর্কে এখানে যা শুনলাম তা সত্যিই ভয়াবহ।

তার শরীরে নাকি দশটা বাঘের শক্তি। তার দলে আছে ভয়ঙ্কর সব জলদস্যু। জটাই তার দলবল নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে সুন্দরবনের জলে-ডাঙায় ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। তার নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রাণ দিয়েছে অনেক মানুষ। কিন্তু পুলিশ তাকে এযাবৎ কব্জা করতে পারেনি। যদিও সে বার কয়েক পুলিশের ফাঁদে পড়েছে কিন্তু ফাঁদ কেটে পালাতেও দেরি হয়নি তার।

এমন একজনের নজর পড়েছে রিকার্দোর পূর্বপুরুষের গুপ্ত ধনাগারের দিকে। বোঝাই যাচ্ছে এবার আর সহজে তাকে নিরস্ত করা যাবে না। গুপ্তধন সে যেভাবে হোক লুটে নেবে।

জটাই যে কত ধুরন্ধর সে প্রমাণ তো গত
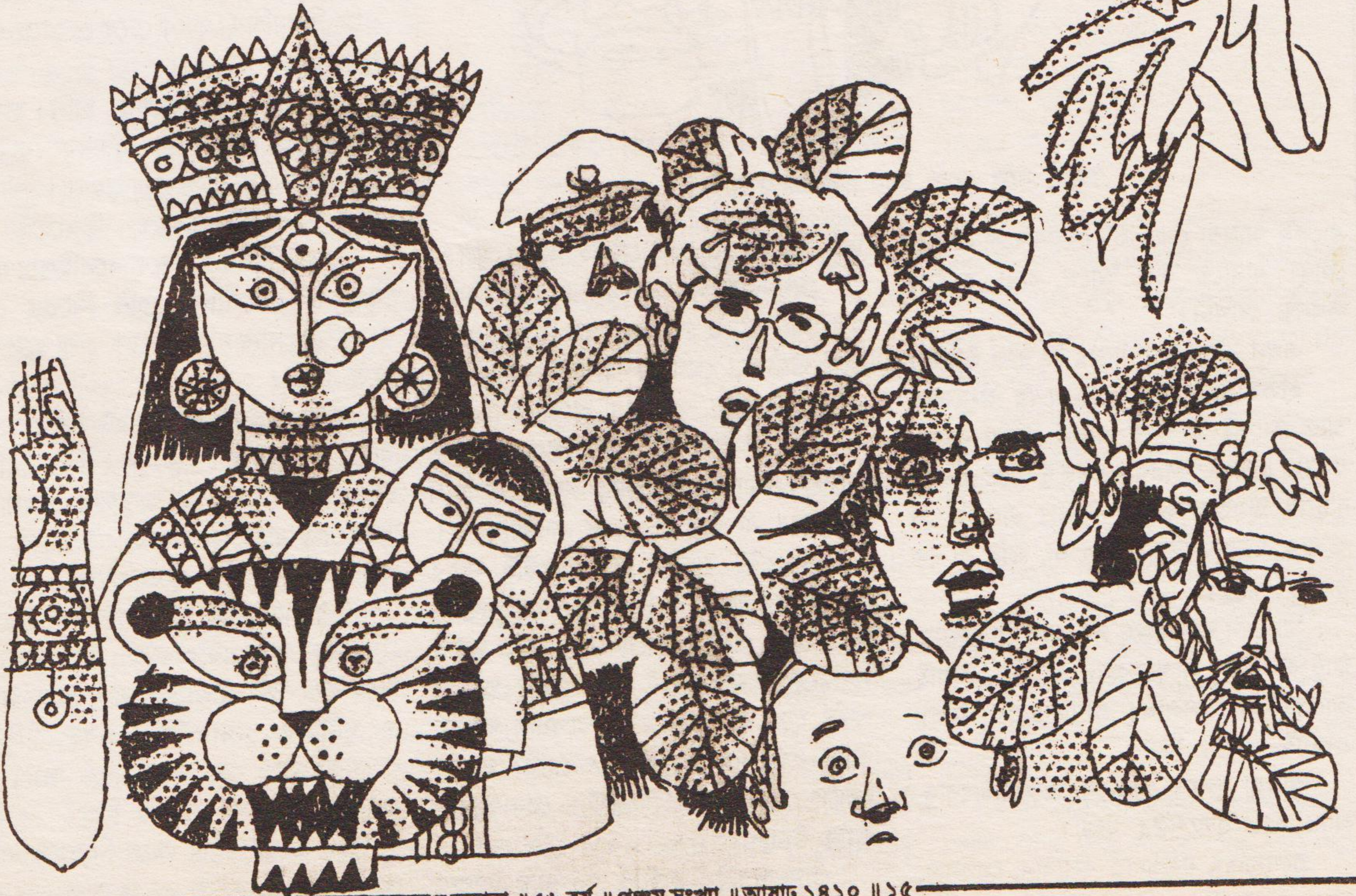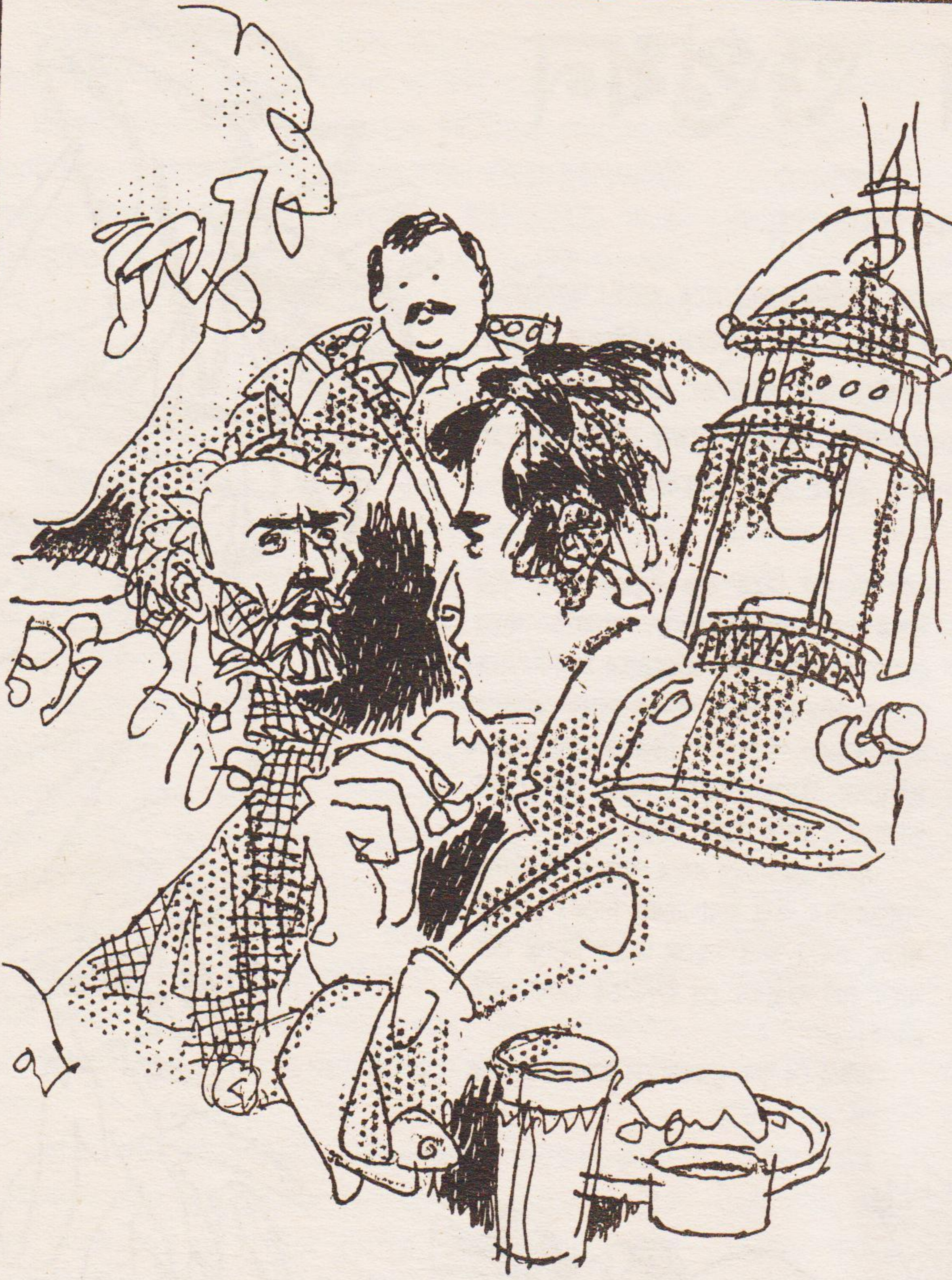
হুজুর, মনে হচ্ছে জায়গাটা আমি চিনি।

রাতেই আমরা পেয়েছি। মেঘনাদকে এভাবে বোকা বানাতে এর আগে অন্য কাউকে কখনও দেখিনি।

এখন তাহলে আমাদের কি করা উচিত?

ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকজনের অনুরোধে আজ থেকেই এ গাঁয়ে একটা পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। কারণ পরপর দু'রাতে এখানে দু'দুটো ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটলো। এরপর যে আবার এরকম কিছু ঘটবে না, তাই বা কে বলতে পারে?

সারাদিন নানা হৈচৈ গণ্ডগোল উত্তেজনায় কাটার পর সন্ধ্যেবেলা আমরা সবাই আলোচনায় বসলাম। আলোচনার বিষয় একটাই—অতঃ কিম্?

আমরা বলতে মেঘনাদ, প্রসেনজিৎবাবু, আমি আর ইন্সপেক্টর খাঁড়া।

প্রসেনজিৎ মজুমদার বললেন, মেঘনাদ, তুই কী করতে চাস সেটাই আগে বল?

মেঘনাদের মুখভাব গম্ভীর। হ্যারিকেনের স্বল্প আলোতেও দেখলাম ওর চিবুক দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছে। মেঘনাদ বললো, এখন শুধু একটাই করণীয়, তা হলো লক্ষ্যে পৌছনো।

লক্ষ্য বলতে কি তুই গুপ্তধন যেখানে আছে সেখানে পৌছনোর কথা ভাবছিস মেঘনাদ? না জিগ্যেস করে পারলাম না।

নিশ্চয়ই। আমার ধারণা জটাই সর্দার লুই রিকার্দোকে নিয়ে সেখানেই গেছে। গুপ্তধন না পেলেও আমার চলবে অর্ণব, কিন্তু জটাই সর্দারকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত আমার শান্তি হবে না। ওর মতো অপমান আমায় আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি। বলতে বলতে মেঘনাদের চোখ দুটোয় যেন আগুন জ্বলে উঠলো।

মেঘনাদবাবু, তাহলে আপনার ধারণা জটাই সর্দার আপনাদের সেই বিদেশী বন্ধুকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে? জিগ্যেস করলেন ইন্সপেক্টর খাঁড়া।

হ্যাঁ। আমার হিসেবও তাই বলে। প্রসেনজিৎবাবু বললেন, কিন্তু মেঘনাদ ভেবে দেখ, আমরা জটাই সর্দারকে অনুসরণ করবো কোন পথে? গুপ্তধনের নকশা তার কাছে। সেইমতো সে তার দলবল নিয়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগেই নদীপথে যাত্রা করেছে। তার গন্তব্যটাও যদি জানা যেত......

প্রসেনজিৎবাবুর কথা শেষ হলো না, তার আগেই ঘরের দরজার কাছ থেকে এক নারীকণ্ঠ ভেসে এল, ওরা কোথায় গেছে আমি জানি হুজুর।

তাকিয়ে দেখি ফুলমণি। সে আমাদের কথার মধ্যে কখন ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আমরা কেউই খেয়াল করিনি।

ইন্সপেক্টর খাঁড়া বললেন, তুমি জানো কোথায় গেছে জটাই সর্দার?

জানি হুজুর। আমার দাদুও সেখানে গিয়েছিল। জায়গাটার নাম ভাঙাদুনি দ্বীপ।

ভাঙাদুনি দ্বীপ! ইন্সপেক্টর খাঁড়া বললেন, সে তো একেবারে দক্ষিণে সাগর মোহনায়। সুন্দরবনের কোর অঞ্চল। নিষিদ্ধ সে ঘোর জঙ্গলে মানুষের প্রবেশের অধিকার নেই।

হ্যাঁ হুজুর। দাদুর মুখে শুনেছি সেই দ্বীপের গভীর জঙ্গলের মধ্যে আছে এক ভাঙা শিবমন্দির। তাকে ঢেকে রেখেছে একশো ঝুরির এক বটগাছ।

বটগাছ! অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন প্রসেনজিৎ মজুমদার। সুন্দরবনের এসব এলাকায় সহজে বটগাছ জন্মায় না। এখানকার নরম নোনামাটি বটগাছের উপযোগী নয়।

কথাটা আমিও দাদুকে বলেছিলাম হুজুর। কিন্তু দাদু বলেছেন তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। বাবা দক্ষিণরায়ের কৃপা হলে সবই হতে পারে।

আমি বললাম, শুনেছি বট-অশ্বত্থ বহুবছর বাঁচে। তাদের প্রাণশক্তি খুব বেশি। এমনিতে হয়তো ওসব গাছ এ জায়গায় জন্মায় না, তবে কেউ যদি কোনোকালে ওই গাছের চারা ওখানকার মাটিতে পুঁতে থাকে.....

তবু ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক নয়।

মেঘনাদকে এবার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ইন্সপেক্টর খাঁড়া বললেন, মেঘনাদবাবু, এ দুনিয়ায় অস্বাভাবিক এবং ব্যতিক্রম ব্যাপারগুলোও তো মাঝে মাঝে ঘটে। মনে করুন এটাও সেই রকমই কিছু।

তবু এ ব্যাপারটা মেনে নিতে আমাদের যে দ্বিধাটুকু ছিল, তা ভেঙে দিল ভটভটির

মাঝি নগেন জানা—সেদিন রাতেই।

সে রাতে দেউলপোতার নতুন পুলিশ ক্যাম্পে আমরা সবাই রাতের খাবার খেতে বসেছি। নগেন জানাও ছিল আমাদের মধ্যে। খেতে খেতে আলোচনা করছিলাম ফুলমণির মুখে শোনা সুন্দরবনের মোহনায় ভাঙাদুনি দ্বীপ নিয়ে, সেখানকার গভীর জঙ্গলে নাকি আছে একশো ঝুরি বট আর তার মাঝে এক শিবমন্দির। তাহলে কি চারশো বছর ধরে সেখানেই লুকানো আছে পর্তুগীজ জলদস্যুদের গুপ্তধন?

কিন্তু প্রশ্ন হলো এ তথ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য? সুন্দরবনের জঙ্গলে ভাঙা শিবমন্দির কিংবা বটগাছের অবস্থান সবটাই কেমন ধোঁয়াশা মনে হচ্ছে। যদিও একটু আগেই মেঘনাদ বলছিল সুন্দরবন আজ গভীর জঙ্গলে ঢাকা হলেও এককালে ওখানে জনবসতি ছিল। আর চারশো বছর আগে মুঘল আমলে পর্তুগীজ জলদস্যুরা যখন সারা দক্ষিণ বাংলায় লুটপাট চালাত, গ্রাম থেকে নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশুদের নদীপথে তুলে নিয়ে যেত, বিক্রি করতো দাস-দাসীর হাটে—তখন এই সুন্দরবনে ছিল তাদের ঘাঁটি। সে স্মৃতি আজও আছে এখানকার কয়েকটি অঞ্চলের নামের সঙ্গে জড়িয়ে, যেমন ফিরিঙ্গি খাল, ফিরিঙ্গির ফাঁড়ি ইত্যাদি।

প্রসেনজিৎ মজুমদার এসময়ে মেঘনাদের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, এসব ইতিহাস না হয়ে মেনেই নিলাম। এটাও না হয় মানলাম সেই সাগর মোহনায় ভাঙাদুনি দ্বীপে সত্যি সত্যি লুকোনো আছে পর্তুগীজ জলদস্যুর গুপ্তধন। কিন্তু নিষিদ্ধ কোর এরিয়ায় তা কি সত্যিই খুঁজে পাওয়া সম্ভব, আর খোঁজার দরকারই বা কি?

দরকার আছে প্রসেনজিৎবাবু। এবার ভীম গর্জন করে উঠলেন ইন্সপেক্টর খাঁড়া—, গুপ্তধন উদ্ধারের চেয়েও বড় কথা সেই বদমাইশ জটাই সর্দারের দলকে গ্রেফতার করা। ওরা শুধু জুরান গুণিনকে খুন করেই ফেরার হয়নি, সেই সঙ্গে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে আমাদের এক বিদেশী অতিথিকে। তাঁকে খুঁজে বার করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এ এলাকার শান্তিরক্ষক হিসেবে সে দায়িত্ব আমি অস্বীকার করতে পারি না। আপনি কি বলেন মেঘনাদবাবু?

আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, মেঘনাদ বললো, আমার অবশ্য এই সঙ্গে আর একটা আকর্ষণ আছে। আর সেই আকর্ষণেই ঘরের চার দেয়াল ছেড়ে জল-জঙ্গল-বিপদের দেশে যাত্রা করেছি আমরা।

মনে মনে হাসলাম। এতক্ষণে মেঘনাদ তার মনের আসল কথাটা বলেছে। বহুদিন বাদে এক ভয়ঙ্কর অভিযানের সুযোগ এসেছে আমাদের সামনে। তাই রক্তে বেজে উঠেছে মাদল। সুতরাং এ পথের শেষ না দেখে আমরা কিছুতেই ফিরতে পারবো না।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু সুদূর সাগর মোহনায় সেই হিংস্র শ্বাপদসংকুল ভাঙাদুনি দ্বীপের একশো ঝুরির বটয়েরা মন্দিরে আমরা পৌঁছবো কি উপায়ে? নকশা ছাড়া পথ খুঁজে পাব কি করে?

এসময়ে হঠাৎ নগেন জানা বললো, হুজুর, মনে হচ্ছে জায়গাটা আমি চিনি।

নগেনের কথা শুনে আমরা সবাই থমকে গেলাম। ইন্সপেক্টর চোখ পাকিয়ে নগেনকে বললেন, বাজে কথা বলার জায়গা পাসনি! সুন্দরবনের সেই নিষিদ্ধ এলাকায় তুই ঢুকলি কি করে? তাহলে কাঠ চুরি করতে গিয়েছিলি বল? নাকি চোরাশিকারীদের পথ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলি?

না হুজুর। আমি ওখানে গিয়ে পৌঁছেছিলাম নেহাত দৈব দুর্বিপাকে। ভয়ঙ্কর সেই জায়গা। কোনোভাবে সেখান থেকে বেঁচে ফিরেছি।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলবে নগেন? মেঘনাদ বেশ শান্ত কণ্ঠেই কথাটা জিগ্যেস করলো।

হ্যাঁ হুজুর। বলি শুনুন।

নগেন জানা যে খুব সুন্দর গুছিয়ে গল্প শোনাতে পারে সে পরিচয় তো আমরা আগেই এখানে আসার পথে পেয়েছি। আর গল্পের মতো মনে হলেও ও দাবি করে সে সবই ঘটেছে ওর জীবনে। প্রমাণস্বরূপ ওর বুকে পিঠে বাঘের থাবার চিহ্ন পর্যন্ত ও আমাদের দেখিয়েছে। কিন্তু এবার ও যা শোনালো তা আরও রোমাঞ্চকর।

নগেন জানার অভিজ্ঞতা

ঘটনাটা বেশিদিন আগের নয়। গত বছর বোশেখ মাস নাগাদ।

নগেন আর ওর খুড়ো যোগেন জানা নৌকো নিয়ে সাগরে গিয়েছিল মাছ ধরতে।

সুন্দরবন ছাড়িয়ে বঙ্গোপসাগরের অথৈ জলরাশির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল ওদের নৌকোটা।

ওই সব জায়গায় ঠিক মতো জাল ফেলতে পারলে বাগদা চিংড়ির ঝাঁক থেকে শুরু করে আরও অনেক রকম সামুদ্রিক মাছ কপালে জোটে। সে সব বিক্রি করতে পারলে হাতে হাতে লাভ। তাই মাঝে মাঝে সাহসে ভর করে নগেন জানা সুন্দরবনের মোহনা ছেড়ে আরও দূরে চলে যায়.....বলতে বলতে ইন্সপেক্টর খাঁড়ার দিকে তাকিয়ে জিভ কাটে নগেন, মাফ করবেন হুজুর। আমরা গরিব জেলে। সব সময় আপনাদের অনুমতি নিতে পারি না।

ইন্সপেক্টর কিছু বলার আগেই মেঘনাদ বলে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। এখনকার মতো তোমার সে সব অপরাধ মাফ করে দেবেন দারোগা সাহেব। তুমি আসল ঘটনাটা বল।

হ্যাঁ হুজুর। নগেন জানা আবার বলতে শুরু করে ঃ

সেদিন যখন খুড়ো-ভাইপো নৌকো নিয়ে বেরিয়েছিল তখন আকাশ ছিল পরিষ্কার। কিন্তু সুন্দরবন পার হয়ে সমুদ্রে ঢুকতেই আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। হাওয়ার গতি বাড়তে শুরু করলো।

দেখতে দেখতে ঝড় এল। দুরন্ত সামুদ্রিক ঝড়। সেই সঙ্গে ঢেউয়ের উথাল-পাথাল। মোচার খোলার মতো ঢেউয়ের তালে তালে দুলতে লাগলো ছোট্ট নৌকোটা। দুলতে দুলতে ছুটে চললো অজানার উদ্দেশে।

ভাগ্য ভাল ঝড় বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। ঢেউয়ের তাণ্ডবও কিছুটা কমলো।

নগেন দেখলো তার নৌকো পৌঁছেছে সমুদ্রের কিনারায়, সেখানে গভীর জঙ্গল। অভিজ্ঞ নগেন জানার মন বললো এ সময়ে ওই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নৌকো নিয়ে ভেসে থাকা অপেক্ষা ওই জঙ্গলের মধ্যে কোনো উঁচু গাছের ওপর বসে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া কম বিপজ্জনক।

অগত্যা নগেন কোনোরকমে তার নৌকোটাকে পাড়ের কাছাকাছি একটা গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে খুড়োকে নিয়ে জঙ্গলে পা দিল। তারপর সামনে যে বড় গাছটা দেখতে পেল তার ওপরে উঠে বসলো।

সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে রাত কাটানোর যে কি অভিজ্ঞতা সে কথা ভাবলে আজও নগেনের সারা শরীর কেঁপে ওঠে।

তবু সারাদিনের ধকল আর ক্লান্তিতে এক সময়ে চোখের পাতা বুজে এসেছিল নগেনের। ঘুমের ঘোরে গাছ থেকে যাতে পড়ে না যায় তাই একটা ডালের সঙ্গে নিজের শরীরটাকে ভালভাবে গামছা দিয়ে বেঁধে বসে থাকতে থাকতে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

যখন ঘুম ভেঙেছিল আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। গাছে গাছে পাখিরা ডাকাডাকি করছে।

Suk—June-3

সাগর মোহনায় উড়ে বেড়াচ্ছে মাছরাঙা ও গাঙতাতাই-এর দল।

হঠাৎ একটা সাদা কাকের গম্ভীর কর্কশ স্বরে চমক ভাঙলো নগেনের। তাকিয়ে দেখলো খুড়ো গাছের ওপরে নেই।

কোথায় গেল খুড়ো? নগেনের মনে শঙ্কা জাগে। তবে কি তার ঘুম ভাঙার আগেই খুড়ো উঠে পড়েছে? গাছ থেকে নেমে গেছে প্রাতঃকৃত্য সারতে? এদিক-ওদিক তাকাতে হঠাৎ নজর পড়লো নগেনের—খুড়ো যেখানে বসেছিল, সেখানে গাছের ডালে এখনও খুড়োর গামছাটা জড়ানো রয়েছে। দেখে ওই সাত সকালেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো নগেনের। তবে কি গত রাতে গাছ থেকে ঘুমের ঘোরে কোনোভাবে পড়ে গেছে খুড়ো? ভালভাবে গাছের নিচেটা লক্ষ্য করলো সে। কই, কোথাও তো খুড়োর কোনো চিহ্ন নেই। আশঙ্কায় মনের ভেতরটা দুলতে শুরু করলো। গাছের ওপর বসে দু-হাত মুখের কাছে জড়ো করে হাঁক দিল নগেন, খুড়ো.....খুড়ো তুমি কোথায়? খুড়ো তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

তার চিৎকারে সুন্দরবনের ভোরের প্রকৃতিতে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। আশপাশ থেকে পাখিরা ডেকে উঠলো। ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাছে গাছে চেঁচামেচি শুরু করলো বাঁদরের দল।

কিন্তু খুড়োর কোনো সাড়া পেল না নগেন জানা।

তীব্র আশঙ্কা তখন নগেন জানার মাথার মধ্যে হুল ফোটাতে শুরু করেছে। তার খুড়ো বয়স্ক মানুষ। ইদানিং শরীরটাও ভাল যাচ্ছিল না। তবে জলে-জঙ্গলে তার অভিজ্ঞতা অনেক দিনের আর সে কারণেই খুড়োকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবারে টেনে এনেছে নগেন। এখন তাকে সঙ্গে না নিয়ে নগেন ফিরবে কোন মুখে? খুড়ি আর তার ছেলেকে মুখই বা দেখাবে কি করে?

বাবা দক্ষিণরায়ের নাম করতে করতে গাছ থেকে নেমে এল নগেন। তারপর আবার হাঁকতে শুরু করলো, খুড়ো....খুড়ো ....তুমি কোথায়....? কিন্তু হাজার ডেকেও খুড়োর সাড়া পাওয়া গেল না।

তখন কী করলে? নগেনের মুখে রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে শুনতে সবাই কেমন যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছিলাম না।

আমার কথা শুনে নগেন আমার দিকে ফিরে বললো, হুজুর, আমার তখন খুড়োর খোঁজ না করে ফেরার কোনো উপায় নেই। এ জন্যে যে কোনো বিপদের ঝুঁকি স্বীকার করতে আমি তৈরি। তাই খুড়োকে ডাকতে ডাকতে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে শুরু করলাম।

কিছুক্ষণ পরে নগেন জানা আবার বলতে শুরু করলো ঃ

খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম। গভীর সে অরণ্য। হুজুর, বলবো কি মনের তাড়সে কিংবা বাবা দক্ষিণরায়ের কৃপায় সেদিন আমায় কোনো ভয় ছুঁতে পারছিল না।

জলা আর জঙ্গলের পথ মাড়িয়ে, লতা-গুল্ম আর হেঁতালের বন পার হয়ে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম।

একটু দূরে একটা উঁচু সমতল ক্ষেত্র। সেখানে গোটা কয়েক ইমারতের ভগ্নাবশেষ।

ইমারাতের ভগ্নাবশেষ! প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর খাঁড়া।

হ্যাঁ দারোগাবাবু। স্পষ্ট মনে আছে একটা ভাঙা মন্দির আর সেই মন্দিরটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে মাথা তুলে রয়েছে বিশাল একটা বটগাছ। সেই বটের অসংখ্য ঝুরি অনেকটা জায়গা জুড়ে নেমে এসেছে। এক একটা ঝুরি এক একটা কাণ্ডের মতো মোটা।

অর্থাৎ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই পুরনো বটের মতো! কিন্তু সুন্দরবনের মাটিতে.....

রেঞ্জার প্রসেনজিৎ মজুমদারের কথা শেষ হবার আগেই নগেন জানা বললো, হুজুর, সেদিন প্রথমটা আমিও অবাক হয়েছিলাম। সুন্দরবনের ওই সব এলাকায় বটগাছ সাধারণত দেখা যায় না। তবে হুজুর এ দুনিয়ায় অসম্ভব বলে বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

নগেন কথাটা ভুল বলেনি। এবার মেঘনাদ বললো, হয়তো বহুকাল আগে কোনো কারণে ও জায়গায় বটের চারা পুঁতে কিছুকাল পরিচর্যা করেছিল। বিশেষত এ গাছের জীবনীশক্তি খুবই বেশি। সহজে মরে না।

আর হুজুর ওই বটগাছের নিচেই আমি আমার খুড়োকে খুঁজে পেলাম। যাক্। তাহলে খুঁজে পাওয়া গেল।

হ্যাঁ হুজুর! তবে ততক্ষণে খুড়োর শরীরের অর্ধেকটা কোনো হিংস্র নিশাচরের পেটে চলে গেছে। খুবলে খাওয়া রক্তাক্ত শরীরের কিছুটা শুধু পড়ে রয়েছে বটগাছটার তলায়।

সেকি! তার মানে আগের রাতে তোমার খুড়ো কোনো সময়ে ঘুমন্ত অবস্থায় গাছ থেকে পড়ে যায় এবং আশপাশেই ছিল সুন্দরবনের রাজা বাঘ!

হ্যাঁ হুজুর। এ দৃশ্য চোখের সামনে দেখে সেদিন নিজেকে কি করে সামলে আবার নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছিলাম তা জানেন শুধু সুন্দরবনের বড় ঠাকুর......বলতে বলতে নগেন জানার দু-চোখ ছলছল করে উঠলো।

এরপর কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললো না, তারপর মেঘনাদই স্তব্ধতা ভেঙে বললো, নগেন তুমি আমাদের সেই জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবে? ঠিক করে বল।

কেন পারবো না হুজুর? এই নগেন জানার শরীরেও সোঁদরবনের ঘাম রক্ত আছে। সে তাই জঙ্গলের বাঘ কিংবা নদীর জলদস্যু কাউকে ডরায় না।

সাবাস! মেঘনাদ বললো, তাহলে তৈরি হও। আগামীকালই আমরা যাত্রা শুরু করবো।

মেঘনাদ! তুই কি সত্যিই.....?

আলবৎ প্রসেনজিৎ! জলদস্যুর গুপ্তধনের জন্যে না হলেও আমাদের বিদেশী অতিথি আর তার ভাই ফ্রান্সিসকে এই জল-জঙ্গলের বিভীষিকা থেকে উদ্ধারের জন্যও আমাদের সেখানে পৌঁছনো জরুরি।

যদি অবশ্য এখনও তারা জীবিত থাকে। পাশ থেকে ইন্সপেক্টর খাঁড়া মন্তব্যটা করলেও বোধকরি তা মেঘনাদের কানে পৌঁছলো না, অথবা সে গ্রাহ্য করলো না।

তবে আমি বুঝলাম আমাদের সুন্দরবন অভিযানের আসল রোমহর্ষক অধ্যায় এবার শুরু হলো।

(চলবে)

ছবি ঃ সমীর সরকার

জলদস্যুর গুপ্তধন

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[মাথায় হাত মেঘনাদদের। নকশা নেই। কি করে খুঁজে বার করবে লুই রিকার্দোকে? জটাই সর্দার কোথায় নিয়ে গেছে তাকে? ফুলমণি এগিয়ে এসে বলে সে জানে জায়গাটার নাম ভাঙাদুনি দ্বীপ। সেখানে আছে এক ভাঙা শিবমন্দির আর একশো ঝুরির বটগাছ। তবে দ্বীপটি সুন্দরবনের নিষিদ্ধ এলাকায়। কে চেনে তার পথ? এবার উত্তর দেয় মাঝি নগেন জানা। মেঘনাদদের আশ্বস্ত করে সে বলে ভাঙাদুনিতে সে-ই নিয়ে যাবে তাদের।]

জটাই-এর আর এক কীর্তি

আমরা ভেবেছিলাম পরদিন সকালেই অভিযান শুরু করবো। কিন্তু বেরুতে আরও একটা দিন দেরি হয়ে গেল।

দেরির মূল কারণ অভিযানের সব কিছু গোছগাছ করা। মেঘনাদ তো চেয়েছিল নগেন জানার ভটভটিতেই যাত্রা করতে, কিন্তু রাজী হলেন না ইন্সপেক্টর খাঁড়া। বললেন, না মেঘনাদবাবু, ওই ঘোর জঙ্গলে যাবার পক্ষে এটা একটু বেশি রিস্ক নেওয়া হয়ে যাবে। তাছাড়া যাদের আমরা তাড়া করছি সেই দুর্ধর্ষ জলদস্যু জটাই সর্দার আর তার দলবলের মোকাবিলার জন্যে আমাদের আরও কিছু লোকবল চাই। অন্তত জনা চারেক অস্ত্রধারী গার্ড তো অবশ্যই দরকার।

প্রসেনজিৎবাবুও দেখলাম ইন্সপেক্টর খাঁড়ার প্রস্তাবে সায় দিলেন। অগত্যা মেঘনাদকেও তাঁর যুক্তি মেনে নিতে হলো। এরপর জঙ্গলের ওই নিষিদ্ধ 'কোর এরিয়ায়' যাকে বলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল সেখানে এমন একটা অভিযান

চালাবার জন্যে সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন হলো। অবশ্য পুলিশ এবং ফরেস্ট রেঞ্জার যেখানে সঙ্গী আর অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছে স্বয়ং রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ সেখানে কোনো কিছুই আটকালো না। চটপট অনুমতি পাওয়া গেল, পাওয়া গেল চারজন সশস্ত্র ফরেস্ট গার্ড আর বিশেষ ধরনের মজবুত ছোটখাট একটা মোটর লঞ্চ।

এসব যোগাড়যন্ত্র সেরে আমরা সঙ্গে যতটা সম্ভব শুকনো খাবারদাবার এবং জল নিয়ে পরদিন ভোরবেলা দেউলপোতা ছেড়ে নদীতে ভেসে পড়লাম। আমাদের প্রথম লক্ষ্য সাগর মোহনার নিকটবর্তী সেই গহন ভাঙাদুনি দ্বীপের জঙ্গল। আমাদের প্রধান গাইড নগেন জানা।

প্রকৃতি এই সময়টা বড় মনোরম। বসন্তকাল। শীত-গ্রীষ্ম কোনোটারই প্রাবল্য নেই।

আমাদের মোটর লঞ্চ দ্রুত এগিয়ে চলছিল নদীপথে মোহনার দিকে।

এখানে নদী বেশ চওড়া। প্রায় সাগরের মতোই বিশাল বলা যায়। দূরে দু'পাশে তটরেখা। সে তট যেন জঙ্গল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

আমরা সবাই লঞ্চে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত প্রকৃতির দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। বেশ ভাল লাগছিল।

এই ভাবে সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। আমাদের চলার বিরাম নেই। অথৈ জলরাশির মধ্যে শুধু আমাদের মোটর লঞ্চের একঘেয়ে যান্ত্রিক শব্দ।

এ পর্যন্ত কোথাও কোনো জনপ্রাণী চোখে পড়েনি। একটু আগে ইন্সপেক্টর খাঁড়া বলছিলেন দূর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া জেলে নৌকো ছাড়া এখানে খুব বেশি জলযান চলে না। কদাচিৎ অবশ্য জাহাজ দেখা যায়। কিন্তু আজ সেসব কিছুই দেখতে পাইনি। মাঝে মাঝে জলের ওপরে লাফিয়ে উঠেছে শুশুকের ঝাঁক অথবা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেছে একটা-দুটো শঙ্খচিল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

আর ঠিক তখনই চোখে পড়লো দূরে একটা নৌকো।

আমাদের লঞ্চের একজন গার্ডই সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, হুজুর, ওই দেখুন। নদীতে একটা নৌকো ভাসছে গো।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেদিকে দৃষ্টি ফেরালাম। হ্যাঁ, তাই তো। বেশ কিছুটা দূরে নদীর ঠিক মাঝখানে একটা জেলে নৌকো—ঢেউ-এর তালে তালে দুলছে।

অদ্ভুত! প্রসেনজিৎবাবু পাশ থেকে বললেন, এমন তো হবার কথা নয়। দেখ তো মেঘনাদ, নৌকোয় কোনো মানুষ আছে কিনা?

প্রসেনজিৎবাবু বলার আগেই অবশ্য মেঘনাদ ওদিকে দূরবীন চোখে তাকিয়েছে। আর তারপরই মোটর লঞ্চের সারেং ইয়াকুবকে হুকুম করেছে, ইয়াকুব লঞ্চ ঘোরাও। ওই নৌকোর দিকে চল।

আমি বললাম, ওখানে কি দেখলি মেঘনাদ?

মেঘনাদ দূরবীনটা আমার হাতে দিয়ে বললো, নিজেই দেখ।

হ্যাঁ দেখলাম। আশ্চর্য এক দৃশ্য। দূরের ওই জেলে ডিঙিতে একজন মানুষ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর নৌকোটা ভেসে চলেছে আপনমনে। যে কোনো মুহূর্তে ওটা উল্টে যেতে পারে। তাহলে ওই মানুষটার নিশ্চিত মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না।

এ অবস্থা থেকে লোকটিকে উদ্ধার করা আমাদের প্রথম কর্তব্য। সুতরাং আমাদের মোটর লঞ্চ সেদিকেই এগিয়ে চললো।

লঞ্চ জেলে ডিঙিটার কাছাকাছি পৌঁছতেই একজন গার্ড ইব্রাহিমকে পাঠানো হলো লোকটিকে উদ্ধার করে আনার জন্যে।

ইব্রাহিম যখন লোকটিকে আমাদের মোটর লঞ্চে তুলে আনলো, তার অর্ধচেতন অবস্থা দেখে মনে হলো কেউ তার ওপর রীতিমতো অত্যাচার করে তাকে এই ভয়ঙ্কর নদীতে হাত-পা বেঁধে একটা জেলে ডিঙির মধ্যে ফেলে রেখে গেছে।

লোকটিকে স্থানীয় জেলে বলেই মনে হয়। তবে বেশ শক্তসমর্থ বেঁটেখাটো চেহারা।

লোকটির চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ফ্লাস্ক থেকে গরম দুধ তার মুখে ঢেলে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি বেশ চাঙা হয়ে উঠলো। তারপর ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রথমেই যে কথাটা বললো, তা হলো, জটাই সর্দার হুজুর। জটাই সর্দার। আমার দুজন সঙ্গীকে সে মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তারপর আমায় জখম করে নৌকোয় যা কিছু ছিল সব লুটে নিয়ে পালিয়েছে।

কোথায় সে শয়তান? কোন দিকে গেছে? ইন্সপেক্টর খাঁড়া গর্জে উঠলেন।

ওই দিকে হুজুর। ওদিক পানে। এই বলে লোকটি আমাদের মোটর লঞ্চ যেদিকে যাচ্ছিল তার বাঁদিকে নদীর একটা বাঁক নির্দেশ করলো।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, কী ছিল তোমার নৌকোয়? এদিকে এসেছিলে কেন? জান না এখানকার জঙ্গলে ঢোকা বারণ? নিশ্চয়ই জঙ্গলে ঢুকেছিলে চোরাশিকার করতে?

ঠিক বলেছেন। পাশ থেকে সমর্থন জানালেন ইন্সপেক্টর খাঁড়া, খামোখা তোমার নৌকোয় চড়াই বা হলো কেন জটাই? নিশ্চয়ই লুট করার মতো কিছু ছিল?

হুজুর, বনবিবির কিরা। আমরা পোচার (চোরাশিকারী) নই হুজুর। মোহনায় গিয়েছিলাম মাছ ধরতে। আজকাল নদীর জল দূষিত হচ্ছে, ভেতর নদীতে ভাল মাছের ঝাঁক আসে না হুজুর। তাই গতকাল তিনজনে নৌকো নিয়ে মোহনা পার হয়ে গিয়ে জাল ফেলেছিলুম। বনবিবির দয়ায় অনেক মাছ উঠেছিল গো। সেই মাছ নিয়ে ফিরছিলুম। ভেবেছিলুম এবার কটা দিনের জন্যে কপাল ফিরলো। কিন্তু তা আর হলো না হুজুর। মাঝ নদীতে ভটভটিতে এসে চড়াই হলো জটাই সর্দারের দল। প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় বললো লোকটা, সব লুটে তো নিলই, আমার সঙ্গী দুজনকেও মেরে ফেলে দিল মাঝ নদীতে। এতক্ষণে তারা সোঁদরবনের হাঙর-কুমীরের গর্ভে গো হুজুর...........

লোকটা এক নাগাড়ে তার বিপদের কথা শুনিয়ে চলেছিল। শুনতে শুনতে রাগে উত্তেজনায় ফুলছিলেন ইন্সপেক্টর

দেখুন তো, ওই দূরে জলে কি যেন ভাসছে।

খাঁড়া। প্রসেনজিৎবাবুও বেশ উত্তেজিত। বললেন, ইন্সপেক্টর, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। জটাই সর্দার দিনে দিনে সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ঠিক বলেছেন রেঞ্জার সাহেব, এবার এর বিহিত হবে। বাঘের ঘরে ওই ঘোগের বাসা আমি ভাঙবোই ভাঙবো। বলতে বলতে সেই উদ্ধার করা লোকটির দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর খাঁড়া বললেন, অ্যাই কি নাম তোর?

আজ্ঞে পরেশ মণ্ডল হুজুর।

জটাই সর্দার ওই দিকে গেছে তুই ঠিক দেখেছিস?

হ্যাঁ হুজুর। নদীর ওই বাঁকটার বাঁদিকে।

কিন্তু আমাদের গন্তব্য ডানদিকে হুজুর। পাশ থেকে হঠাৎ বললো পথনির্দেশক নগেন জানা।

চুলোয় যাক। পুলিশের সামনে দিয়ে ডাকাত পালাবে আর পুলিশ মুখ ফিরিয়ে থাকবে তেমন পুলিশ এই অনন্তদেব খাঁড়া নয়। বলতে বলতে বোটের সারেং ইয়াকুবকে প্রায় হুঙ্কার করে হুকুম করলেন, লঞ্চ ঘোরাও।

লঞ্চ ছুটে চললো অন্য পথে—আর এক বাঁকের দিকে।

মোটর লঞ্চের সামনের দিকে হাতে দূরবীন নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন ইন্সপেক্টর খাঁড়া তাঁর চারজন পুলিশ গার্ডকে পাশে নিয়ে।

ইতিমধ্যে দিনের আলো কমতে শুরু করেছে। সাগর মোহনায় অস্ত গেল টকটকে লাল সূর্যটা। এর মধ্যে আমাদের চলার পথ থেকে অনেকটা সরে এসেছি। কিন্তু কোথায় জটাই সর্দার কিংবা তার ভটভটি?

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। এতটা সময়ের মধ্যে মেঘনাদ কোনো কথা বলেনি। ওর ভ্রু দুটি কুঞ্চিত। ও কি অন্য কিছু ভাবছে?

ওর পাশে গিয়ে ধীরে ধীরে প্রশ্নটা করতে মেঘনাদ একবার আমার দিকে তাকালো তারপর চুপি চুপি বললো, বুঝলি অর্ণব, ইন্সপেক্টর খাঁড়া লোকটিকে শুধু গবেট বললেও কম বলা হয়।

শুনে চমকে উঠলাম, তোর একথার মানে?

মানেটা নিজেই বুঝতে পারবি। কিন্তু এর মধ্যে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেল।

মেঘনাদের কথাগুলো তখন নেহাত হেঁয়ালি মনে হলেও, ও যা অনুমান করেছিল তা মিলে গেল সে রাতের অন্ধকার জমাট বাঁধার আগেই।

ঘড়িতে তখন সবেমাত্র সন্ধ্যে সাড়ে ছটা হলেও এরই মধ্যে প্রকৃতিতে নেমে এসেছে গভীর রাতের অন্ধকার। আশপাশে কোথাও কোনো শব্দ নেই। শুধু আমাদের মোটর লঞ্চ ছুটে চলেছে বিরামহীন ভাবে। লঞ্চের সামনের স্পটলাইট নদীপথের অনেকটা অংশ দৃশ্যমান করে তুলেছে। কিন্তু কোথায় জটাই সর্দারের ভটভটি?

পরেশ মণ্ডল আমাদের যে পথে নিয়ে চলেছে সেই পথে সত্যিই যদি ভটভটি এসে থাকে তবে তো দ্রুতগতি মোটর লঞ্চ ইতিমধ্যেই তার কাছাকাছি পৌঁছে যেত। কিন্তু কোনো ভটভটি দেখা দূরে থাক সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই।

ইতিমধ্যে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছেন ইন্সপেক্টর খাঁড়া। ওঁর কথাবার্তায় ধৈর্যচ্যুতির প্রকাশ মাঝে মাঝেই ঘটছে। প্রসেনজিৎ মজুমদারকেও এখন কিছুটা বিভ্রান্ত মনে হলো। একমাত্র স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে মেঘনাদ। অন্ধকারের মধ্যেও যেন ওর চোখের পাতা পড়ছে না।

ওই দূরে কি কোনো খাঁড়ি দেখা যাচ্ছে? মেঘনাদকে কিছু একটা বলার উপক্রম করছি হঠাৎ 'ঝপাৎ' শব্দ।

চমকে তাকিয়ে দেখি মোটর লঞ্চ থেকে কে একজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্ধকার নদীর জলে।

শব্দটা সকলেরই কানে পৌঁছেছে। তবে কি কেউ অসাবধানে লঞ্চ থেকে নদীগর্ভে পড়ে গেল? তবে তো মহাসর্বনাশ! সকলেই ছুটে গেল রেলিং ঘেরা সেই জায়গাটায়।

কে? কে পড়ে গেল?

বেশি ভাববার অবকাশ কেউ পেল না। নদীর ওই জায়গা থেকে ভেসে এল ভয়ঙ্কর অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ।

কে? কে ও?

হঠাৎ প্রসেনজিৎ মজুমদার চেঁচিয়ে উঠলেন, পরেশ! পরেশ মণ্ডল ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীর জলে।

হ্যাঁ, তাই তো। পরেশই তো বটে।

নদীর মধ্যে একটা জেলে নৌকো থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যাকে উদ্ধার করা হয়েছিল—তাকে নাকি ওই অবস্থায় ফেলে গেছে জটাই সর্দার, সে এই ভীষণ অন্ধকারে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অট্টহাসি হাসছে!

লোকটা কি পাগল? একটা বিস্মিত গুঞ্জন শুরু হয়।

না, পাগল নয়। ও এক মস্ত শয়তান। এতক্ষণ বাদে মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ও যা চেয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

কী? কী চেয়েছিল ও?

আমাদের সঠিক লক্ষ্যপথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। সোজা কথায় মোটর লঞ্চকে তার যাত্রাপথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে, যাতে তাকে আমরা না ধরতে পারি এবং আমরা পৌঁছোবার আগেই সে তার লক্ষ্যে পৌঁছে কাজ হাসিল করে ফেলতে পারে।

কী সর্বনাশ! এর মানে যে লোকটিকে আমরা জল থেকে উদ্ধার করেছি সে আসলে জটাই সর্দারের দলের লোক? বললেন প্রসেনজিৎ মজুমদার।

হ্যাঁ প্রসেনজিৎ। ও তার কাজ শেষ করে ফিরে যাচ্ছে তার ঘাঁটিতে। আমার ধারণা সামনের ওই খাঁড়িটার ভেতরেই লুকনো আছে জটাই সর্দারের কোনো লুকনো নৌকো। পরেশ সাঁতার কেটে সেদিকেই চলেছে।

কিন্তু তার আগেই যদি ওকে কুমীরে ধরে?

আমার কথা শেষ হবার আগেই প্রসেনজিৎবাবু বললেন, আপনি ওই জলদস্যুদের চেনেন না, তাই একথা বললেন অর্ণববাবু। এদের চেহারা যেমনই হোক, সাহস ভয়ঙ্কর। এরা পারে না এমন কাজ বোধহয় ভূ-ভারতে নেই।

প্রসেনজিৎবাবুর কথা শেষ হবার আগেই আবার গর্জে উঠলেন ইন্সপেক্টর খাঁড়া, ব্যাটা আমাদের বোকা বানিয়েছে। তবে এবার আর ছাড়বো না। মেঘনাদবাবু আপনি বললেন, ওপাশের ওই খাঁড়ির আড়ালেই আছে জটাই সর্দারের নৌকো। চলুন শয়তান পরেশ মণ্ডল সেখানে পৌঁছবার আগেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাই।

না। এবার মেঘনাদ গম্ভীর ভাবে বললো, আর আপনাকে আমি ভুল করতে দেব না ইন্সপেক্টর খাঁড়া। আর আমরা বেপথে গিয়ে সময় নষ্ট করবো না।

তাহলে এখন আমরা কী করবো?

আজকের রাতটা এখানেই লঞ্চ বেঁধে রাখবো তারপর কাল ভোরবেলা আবার যাত্রা করবো আমাদের লক্ষ্যপথে, বলতে বলতে মেঘনাদ গাইড নগেন জানাকে বললো, কি নগেন, এখান থেকে তোমার সেই সুন্দরবনের মোহনার জায়গাটা চিনতে পারবে তো?

নগেন কয়েক মুহূর্ত আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, বোধহয় পারবো হুজুর।

অগত্যা সেটাই স্থির হলো।

জলদস্যুর সংকেত

মেঘনাদ গত রাতে ঘুমোয়নি। আজ ভোরে যখন সবেমাত্র পুব আকাশটা ফর্সা হতে শুরু করেছে, সে হাঁকডাক শুরু করে দিল, ইন্সপেক্টর খাঁড়া, প্রসেনজিৎ, আর দেরি করা ঠিক হবে না। এরপর ও আমাদের লঞ্চের সারেং ইয়াকুবকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল। তাকেও বললো, ইয়াকুব, আধঘণ্টার মধ্যেই লঞ্চ ছাড়তে হবে। আর একটুও দেরি করা চলবে না।

মেঘনাদের এ ব্যস্ততার কারণ আমি বুঝেছি। ইতিমধ্যে জটাই সর্দারের চালাকিতে আমরা নির্দিষ্ট পথ থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছি। এতক্ষণে ওরা হয়তো পৌঁছেই গেছে সাগর মোহনায় সেই ভাঙাদুনি দ্বীপে একশো ঝুরি বটের ছায়ায় ভাঙা শিবতলায়। তারপর সেখানে কী ঘটেছে কে জানে। লুই রিকার্দোর ভাগ্যেই বা কী ঘটেছে কে বলতে পারে? তবে যতক্ষণ না জটাই সর্দার চারশো বছর আগেকার জলদস্যু ঘাঁটিতে পৌঁছে লুই রিকার্দোর পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের সন্ধান পাচ্ছে সম্ভবত ততক্ষণ ওরা লুইকে একেবারে মেরে ফেলবে না। অন্তত আমার হিসেব তো সে কথাই বলে।

ইতিমধ্যে মেঘনাদের হাঁকডাকে লঞ্চের সব মানুষ জেগে উঠেছে। আমাদের গাইড নগেন জানা গিয়ে দাঁড়িয়েছে সারেং ইয়াকুবের পাশে তারপর বনবিবির

নামে জয়ধ্বনি করে ইয়াকুব মোটর লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে।

সাগর মোহনার ফুরফুরে হাওয়ায় শরীর যেন জুড়িয়ে যায়। এ জায়গা থেকে আর কোনোদিন ফিরতে ইচ্ছে হয় না। এখানে বিশাল চওড়া নদী যেন সমুদ্রের মতো।

প্রসেনজিৎবাবু নগেন জানাকে বললেন, কিহে নগেন, আমরা তো আসল পথ থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছি। এখান থেকে পথ চিনে ঠিক মতো ফিরতে পারবো তো?

কি যে বলেন হুজুর! এই নগেন জানার এতখানি জীবনটা শুধু সোঁদরবনের জল- জঙ্গলেই কেটে গেল। এত সহজে কি পথ ভুল হয় আজ্ঞে...

বলতে বলতে নগেন হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে থমকে গিয়ে বললো, হুজুর, দেখুন তো, ওই দূরে জলে কি যেন ভাসছে।

আবার কি ভাসছে হে! বলতে বলতে ইন্সপেক্টর সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দূরবীনটা চোখে লাগালেন।

সত্যি অনেকটা দূরে কী একটা জিনিস ভাসছে মনে হচ্ছে। এতদূর থেকে এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে কোনো নৌকো জাতীয় কিছু নয়।

ইন্সপেক্টর খাঁড়া কিছুক্ষণ দূরবীনে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দূরবীনটা নামিয়ে বললেন, জিনিসটা ঠিক বুঝতে পারছি না মেঘনাদবাবু। তবে মনে হচ্ছে নদীর জলে এক জোড়া ড্রাম ভাসছে।

ড্রাম!

হ্যাঁ, মানে জাহাজ বা লঞ্চে জল রাখার জন্যে যে পাত্র বা ড্রাম ব্যবহার হয়।

আমাদের লঞ্চ অনেকটা এগিয়ে গেছে। এবার খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে।

হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর খাঁড়া ঠিকই বলেছেন। এক জোড়া ড্রাম একসঙ্গে ভাসছে। কিন্তু দুটো ড্রামের মধ্যে বাঁধা ওটা কি?

একটা পতাকা।

হ্যাঁ, পতাকাই তো। ড্রামের সঙ্গে লাঠিতে বাঁধা একটা পতাকা নদীর ফুরফুরে হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে।

পতাকার রং কালো। মাঝখানে আঁকা একটা সাদা মড়ার খুলি আর তার নিচে আড়াআড়ি দুটো হাড়ের টুকরো।

ইন্সপেক্টর খাঁড়াই সর্বপ্রথম বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন, একি! এর মানে কী?

মেঘনাদ ধীরে ধীরে বললো, এর অর্থ একটাই, ওই পতাকা জলদস্যুর প্রতীক বা সংকেত।

জলদস্যুর সংকেত! চমকে উঠে বলি।

আশ্চর্য! প্রসেনজিৎবাবু এবার ধীরে ধীরে বললেন, মধ্যযুগে যে সব ইউরোপীয় জলদস্যুরা পৃথিবীর সাগর মহাসাগরগুলো দাপিয়ে বেড়াত, শুনেছি তাদের জাহাজে টাঙানো থাকতো জলদস্যুর প্রতীক আঁকা এই পতাকা। কিন্তু সুন্দরবনের জলদস্যুকে তো কখনও এমন পতাকা ব্যবহার করতে দেখিনি। মেঘনাদ, তুই কি বলিস?

মেঘনাদ প্রসেনজিৎবাবুর উত্তেজনা সত্ত্বেও এতটুকু অধীর হলো না। শুধু দেখলাম ওর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে বললো, প্রসেনজিৎ আমি শুধু বলি এত তাড়াতাড়ি আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়। খুব শীগগির বোধহয় আমাদের সব হিসেব ওলটপালট হতে চলেছে।

মেঘনাদের এ কথায় কিসের সংকেত বুঝতে পারলাম না।

(চলবে)

ছবি ঃ সমীর সরকার
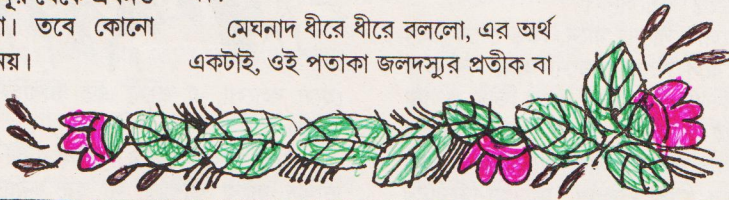
● বিচিত্র খবর

রোগ আরোগ্যে নৃত্য

বরুণ মজুমদার

রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করতে এতদিন সঙ্গীতের বিরাট ভূমিকার কথা বলা হতো। এখন দেখা যাচ্ছে যে, এ ব্যাপারে নৃত্যেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। বিকল্প ওষুধ হিসাবে ধ্রুপদী নৃত্য দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ব্যাঙ্গালোরে বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় ধ্রুপদী নৃত্যকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই রোগে আক্রান্ত বহু রোগী নৃত্যশিক্ষক এ. ভি. সত্যনারায়ণের ক্লাসে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। এই ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী রোগীদের রীতিমতো কসরৎ করে নাচিয়ে তাঁদের রক্ত থেকে অতিরিক্ত শর্করা পুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এইসব নাচের জন্য বিশেষ ধরনের গানও রচনা করেছেন নৃত্যগুরু নিজেই এবং তা রীতিমতো গবেষণা করে।

সত্যনারায়ণের নৃত্যথেরাপি ভারতীয় ধ্রুপদ নৃত্য এবং শ্রুতিমধুর সঙ্গীতের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। নাচের জন্য খুব একটা কসরতের প্রয়োজন হয় না। একজন রোগী নৃত্যশিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে এটার অভ্যেস করতে পারেন। এই নৃত্যথেরাপির আবিষ্কর্তা বলেছেন, নৃত্যের ফলে সারা দেহের ব্যায়াম হয়ে থাকে। এটা রক্তে শর্করার স্তর নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

জলদস্যুর গুপ্তধন

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[লুই রিকার্দোর সন্ধানে মেঘনাদরা সদলবলে রওনা হলো ভাঙাদুনি দ্বীপের উদ্দেশে। নদীপথে তারা উদ্ধার করল পরেশ মণ্ডলকে। লোকটা আসলে জটাই সর্দারের দলের। তাকে পাঠানো হয়েছিল মেঘনাদ ও তার সঙ্গীদের বিপথে চালিত করতে। সে কাজ সাফল্যের সঙ্গে হাসিল করে পালায় পরেশ। পরদিন যাত্রাকালে জলে ভাসমান ড্রামের সঙ্গে বাঁধা একটি পতাকা সকলের নজরে আসে। কিন্তু ইউরোপীয় জলদস্যুদের পতাকা সুন্দরবন অঞ্চলে আসে কি করে?]

চমকের ওপর চমক

সারাটা পথে আর কোনো উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটেনি। তবে খুলি চিহ্নিত পতাকাটা দেখার পর থেকে মোটর লঞ্চের প্রতিটি মানুষ কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই প্রতিমুহূর্তে কোনো নতুন অঘটন আশঙ্কা করছে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটেনি।

আমাদের মোটর বোট নগেন জানার নির্দেশিত পথ ধরে পৌঁছে গেছে সুন্দরবনের একেবারে শেষপ্রান্তে যেখানে সুন্দরবনের মাটি বঙ্গোপসাগরকে স্পর্শ করেছে।

এরপর লঞ্চ সাগরের প্রান্তরেখা ধরে চলেছে সুন্দরবনের দক্ষিণ সীমানায়। তবে একটা কথা প্রত্যেকেরই মনে হচ্ছে, তা হলো বছরখানেক আগে মাত্র একবার এই অপরিচিত অঞ্চলে কোনোভাবে
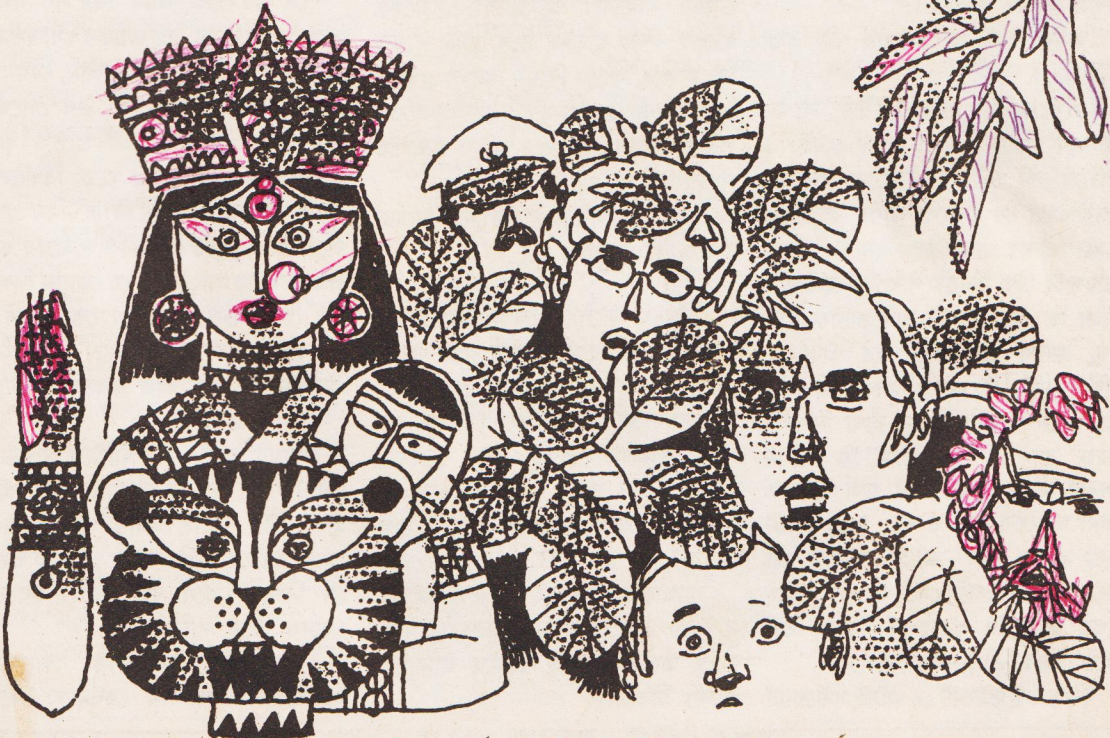
ছিটকে এসে কোনো মানুষের পক্ষে এখানকার কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন কাজ। বিশেষত জল-জঙ্গলের দেশ সুন্দরবনে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে ছোট-বড় নানা দ্বীপ। এর মধ্যে ভাঙাদুনি দ্বীপ যে ঠিক কোনটা তা কি সত্যিই খুঁজে পাবে নগেন?

নগেন জানার চোখ-মুখ দেখলাম কুঁচকে রয়েছে। সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে প্রাণপণে জায়গাটা খুঁজে পেতে চেষ্টা করছে।

যদিও পুরো সুন্দরবন এলাকাটাকেই নাকি নগেন জানা নিজের তালুর মতো চেনে, তবু এতটা কি সম্ভব হবে তার পক্ষে? ইতিমধ্যে দুপুর গড়িয়ে গেছে। দিনের খুব বেশি আর অবশিষ্ট নেই।

আমরা প্রত্যেকেই যখন এসব কথা ভাবছি হঠাৎ ঈশ্বর সহায় হলেন। আমাদের লঞ্চের সারেং ইয়াকুব চেঁচিয়ে উঠলো, হুজুর ভটভটি। ওই দেখুন ভটভটি।

সত্যিই তো! দূরে জঙ্গল ঘেরা এক দ্বীপের তটভূমির কাছে গাছের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একটা ভটভটি। ভটভটিতে জনপ্রাণী নেই। এর একটাই অর্থ—এই ভটভটিতে চেপে যারা এসেছে তারা সবাই জঙ্গলে ঢুকেছে।

এখন প্রশ্ন এ অবস্থায় কি করা উচিত?

প্রথমে আমাদের গাইড নগেন জানাকে জিগ্যেস করা হলো এটাই কি তাহলে সেই ভাঙাদুনি দ্বীপ, যেখানে গত বছর এসে সে একশো ঝুরির বটতলায় ভাঙা মন্দির দেখেছিল? নগেন কিন্তু জায়গাটা ঠিক চিনতে পারলো বলে মনে হলো না। না চেনাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ এখানকার সব অঞ্চলের ছবিই মোটামুটি একই রকম। একবার মাত্র এসে জায়গাটা মনে রাখা নিশ্চয়ই সহজ ব্যাপার নয়। এমন কি নগেন জানার মতো সুন্দরবনের হাল হকিকৎ জানা মানুষের পক্ষেও নয়। তবে একটা কথা মানতে হবে—জটাই সর্দারের দল যখন ভটভটি এখানে বেঁধে জঙ্গলে ঢুকেছে তখন জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওর হাতে আছে এখানকার ম্যাপ।

কিন্তু এই ভটভটি যে জটাই সর্দারেরই তার কি কোনো প্রমাণ আছে? প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

ও ছাড়া এখানে আর কে আসতে পারে অর্ণববাবু? প্রসেনজিৎবাবু বললেন, এটা স্বতঃসিদ্ধ বলতে পারেন।

ইন্সপেক্টর খাঁড়া হঠাৎ বললেন, মেঘনাদবাবু এসব বাদ-প্রতিবাদ ছেড়ে আসুন, সর্বপ্রথমে আমরা এই ভটভটিটাকে অগাধ সলিলে পাঠিয়ে দিই। তাহলেই ওই জলদস্যুর দল সবচেয়ে জব্দ হবে।

না ইন্সপেক্টর। আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। আমি বিশ্বাস করি শত্রুর প্রতি আচরণেও একটা নীতি থাকা উচিত। এখানে ওই মানুষগুলোর ফেরার রাস্তা ওভাবে বন্ধ করা ভয়াবহ নৃশংসতা।

আরে দূর মশাই! আপনি দেখছি রহস্যভেদী না হয়ে মানব অধিকার কমিশনের সদস্য হলেই বেশি মানাতো। ইন্সপেক্টর খাঁড়া বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত স্থির হলো আমাদের মোটর লঞ্চ এখানে রেখে এবং সারেং ইয়াকুব আর তার সহকারী দুজন গার্ডকে পাহারায় রেখে আমরা সাতজন ডাঙায় নামবো। আমাদের প্রত্যেকের হাতেই বন্দুক ছাড়াও সঙ্গে গোটা দুয়েক টর্চ থাকবে, কারণ দিনের আলো এখনও শেষ হয়ে না এলেও সুন্দরবনের জঙ্গলের গভীরে দিনের বেলাতেও অনেক জায়গায় সূর্যের আলো প্রবেশ করে না।

সেই মতো সব বন্দোবস্ত সেরে আমরা ডাঙায় পা দিলাম।

দিনের আলো কমে এসেছে। সূর্য এখন পশ্চিম আকাশে। তবু ঘণ্টা দুয়েক সময় এখনও পাওয়া যেতে পারে।

মেঘনাদের ইচ্ছে খুব বেশিদূর না গিয়ে জায়গাটা একটু দেখে নেওয়া। অন্তত নগেন জানা এখানেই এসেছিল কিনা সেটা ওকে ভাববার একটু সুযোগ দেওয়া।

আমাদের সবারই ধারণা জটাই সর্দারের ভটভটি যখন সমুদ্রপাড়ে বাঁধা আছে তখন এখানেই রয়েছে আমাদের পথের ঠিকানা।

এখানকার জঙ্গল গভীর গহন। তবে মোটেই নিস্তব্ধ নয়। ক্ষণে ক্ষণে দূর থেকে ভেসে আসছে নানা জীবজন্তুর ডাক, সেই সঙ্গে গাছে গাছে নানা পাখির কিচির মিচির। একসঙ্গে এত বিচিত্র পাখির সমাহার আজ পর্যন্ত অন্য কোথাও আমার চোখে পড়েনি। আমি অবশ্য ওদের কারুরই নাম জানি না। নগেন জানাই কয়েকটি পাখি চিনিয়ে দিল। সেই সব পাখিরা মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে গাছে গাছে। আর গাছই বা কত রকমের। বিচিত্র আকার-আয়তন। নগেন জানা সেই সব কিছু কিছু গাছও চিনিয়ে দিচ্ছিল মহা উৎসাহে। বাইন, গরান, গর্জন, সুন্দরী। তবে এখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রয়েছে মাটির ওপর নাক উঁচিয়ে থাকা শ্বাসমূল। আসলে এখানকার ঠাসবুনুনি গাছপালার ভিড়ে মাটির কাছাকাছি বাতাসের বড় অভাব। তাই এই সব গাছ শিকড়ের একটা অংশ মাটির ওপর ঠেলে তুলে বাতাস গ্রহণ করে। স্থানীয় মানুষরা এই শ্বাসমূলকে বলে শুলো। আর এই উঁচিয়ে থাকা শুলোর জন্যে খুব সাবধানে পা ফেলতে হয় বাদাবনের মাটিতে।

সে যাই হোক, আমি যখন সব বিপদ ভুলে সুন্দরবনের এই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যময় প্রকৃতিকে মুগ্ধ চোখে দেখছিলাম, মেঘনাদ কোনো কথা বলছিল না। ওর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সে দৃষ্টি যেন প্রতিটি বৃক্ষ লতাপাতার মধ্যে ছুঁচের মতো বিঁধছিল। এটাই স্বাভাবিক। কারণ বিপদ এখন প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্তে। এমনকি সামনের ওই লতাগুল্মটার আড়ালেও যে কোনো বিপদ ওৎ পেতে নেই, তাই বা কে বলবে?

হঠাৎ ইন্সপেক্টর খাঁড়া বললেন, মেঘনাদবাবু, এক কাজ করলে হয় না?

কি কাজ বলুন?

আমরা যদি এখানে দাঁড়িয়ে আপনার সেই বিদেশী বন্ধু লুই রিকার্দোর নাম ধরে হাঁক দিই? জটাই সর্দার যদি এখনও তাকে বাঁচিয়ে রাখে, আমাদের ডাক শুনে সে নিশ্চয়ই মনে বল পাবে। হয়তো সাড়াও দিতে পারে।

প্রসেনজিৎ মজুমদার বললেন, আইডিয়াটা মন্দ নয় মেঘনাদ। এতে

আমাদের লোকসান কিছু নেই।

কিন্তু বিপদও আছে। আমি বললাম, আমাদের হাঁকডাকে জটাই সর্দারের দল কিন্তু এখানে আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে।

মেঘনাদ আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে বললো, অর্ণব, একটা কথা জানবি। এক সময় না এক সময় আমাদের জটাইয়ের দলের মুখোমুখি হতেই হবে। না হওয়াটাই হবে বেশি বিপদজনক। কারণ তা হলে আমরা তার দলবল এবং শক্তি সম্পর্কে কিছুই ধারণা করতে পারবো না।

এই তো বাপের ব্যাটার মতো কথা। বলেই ইন্সপেক্টর আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে দু'হাত মুখের কাছে ধরে ওঁর বাজখাঁই গলায় ডাকতে শুরু করলেন, মিঃ রিকার্দো....আপনি কোথায়? মিঃ লুই....আমরা আপনাকে খুঁজছি.....।

ইন্সপেক্টর তাঁর হাঁকডাক শেষ করতে পারলেন না—তার আগেই সামনের জঙ্গলের ভেতর থেকে গর্জে উঠলো বন্দুক। ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট।

সাবধান! সাবধান! সবাই শিগগির শুয়ে পড়ুন......তাড়াতাড়ি....এই লতাগুল্ম ঝোপের আড়ালে....

বলতে বলতে মেঘনাদ আমায় একটা হ্যাঁচকা টান মেরে পাশের লতাগুল্মটার আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। দেখাদেখি অন্য সবাই।

একচোট গুলি চলার পর ওদিকটা শান্ত হলো। তারপর শোনা গেল শুকনো পাতা মাড়ানো শব্দ। কারা যেন এগিয়ে আসছে।

আমরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি আগন্তুকদের জন্যে। মেঘনাদ কানের পাশে ফিস ফিস করলো, কোনো-রকম শব্দ করিসনি। যারা আসছে তারা যেন কোনোমতেই আমাদের অবস্থান বুঝতে না পারে।

সামনের ঝোপগুলোর পাতা নড়তে শুরু করলো। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। একটু বাদেই আগন্তুকরা দৃষ্টিগোচর হলো। একে একে আটজন।

সামনের লোকটির দোহারা চেহারা। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। একমাথা ঝাঁকড়া চুলের ওপর লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। পরনে গেঞ্জি আর মালকোঁচা বাঁধা ধুতি। বয়স বছর চল্লিশের বেশি হবে না। চোখের দৃষ্টি কঠোর। ওই লোকটাই বোধকরি দলের নেতা জটাই সর্দার। তার সঙ্গী অন্তত জনাসাতেক দস্যু। ওদের চেহারা ও পোশাক অনেকটাই ওদের সর্দারের মতো। কারুর পরনে মালকোঁচা বাঁধা ধুতির বদলে লুঙ্গি। সকলেই যে খুব শক্তসমর্থ তা বলা যায় না। কারুর কারুর সুঁটকো হাড়গিলে টাইপের গড়ন। তবে ওরা সবাই সশস্ত্র।

সামনের খোলা জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়ে ওরা চারদিকে চোখ ঘোরাতে লাগলো। বেশ বোঝা গেল ওরা আমাদেরই খুঁজছে।

শুকনো পাতার মড়মড়ানি আবার শোনা গেল। এবার জঙ্গলের ভেতর থেকে যে লোকটি বেরিয়ে এল তাকে এখানে এ অবস্থায় দেখবো বোধকরি আমরা কেউই আশা করিনি।

তিনি আমাদের সেই পর্তুগীজ অতিথি বন্ধু লুই রিকার্দো।

কিন্তু একি চেহারা মানুষটার! সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ঢুকে ওঁর চেহারার কাঠামোটাও এভাবে বদলে গেছে!

হাতে বন্দুক। চোখের দৃষ্টি যেন সুন্দরবনের হিংস্র বাঘের মতো।

লুই রিকার্দো জটাই সর্দারের দলটার কাছে এসেই ভীষণ স্বরে জটাইকে আদেশ করলো, ফাইন্ড দেম আউট। উহাদের

ওরা আমাদেরই খুঁজছে।

খুঁজে বার করো।

শুনে চমকে উঠলাম। একি শুনলাম! এখানে লুই রিকার্দোকে তো জটাই-এর বন্দী মনে হচ্ছে না, বরং জটাই সর্দারই লুই রিকার্দোকে দলপতি মেনে নিয়েছে।

এ কি করে সম্ভব?

ওদিকে জটাই-এর দল লুই রিকার্দোর নির্দেশ শুনে বন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।

সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে গাছগাছালির সংখ্যা কম। থাকার মধ্যে রয়েছে গোটাকয়েক গোলপাতা গাছ।

দস্যুগুলো হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় জড়ো হলো। শ্বাপদের দৃষ্টিতে ওরা চারদিকে তাকাতে শুরু করেছে। আমাদের খুঁজছে। এই সব ঢিবি আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবো আমরা? ওরা যদি একবার আমাদের উপস্থিতি টের পায়.....

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে মেঘনাদ চিৎকার করে উঠলো, ফায়ার......

সঙ্গে সঙ্গে এ তরফ থেকে এক ঝাঁক গুলি চললো, র‍্যা....ট....টা...টা...টা......

দুজন দস্যু উল্টে পড়ে গেল। ওদের পায়ে গুলি লেগেছে। সেটা ওদের হাঁটু চেপে ছটফটানি দেখে বোঝা গেল।

অন্যরা থমকে দাঁড়াল। আমাদের তরফ থেকে এই আক্রমণ ওরা বোধহয় ভাবতে পারেনি।

মেঘনাদ আর একবার হাঁক দিল, ফায়ার!

আর এক ঝাঁক গুলি ছুটে গেল এদিক থেকে।

এবার আর লোকগুলো দাঁড়াল না। দুদ্দাড় করে ছুটে গেল যেখান থেকে এসেছিল সেই জঙ্গলের গভীরে। তারপর সেখান থেকে ছুটে আসতে লাগলো ও তরফের গুলি।

কিন্তু সে গুলি আমাদের কাউকে স্পর্শ করতে পারলো না। লড়াই-এর কৌশল আমরা আগেই ছকে রেখেছিলাম। সেই মতো লোকগুলো পেছিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আমাদের জায়গা বদলে ফেলেছি। জঙ্গলের লতাগুল্মের আড়াল দিয়ে গুঁড়ি মেরে আমরা পৌঁছে গেছি বেশ কিছুটা দূরে।

ইতিমধ্যে পশ্চিমের সূর্য অস্তাচলে গেছে। দ্রুত নেমে আসছে অন্ধকার। এক্ষেত্রে আমাদের সুবিধেই হলো। কোনোরকমে পাড়ের কাছে পৌঁছেই আমরা চটপট উঠে পড়েছি আমাদের মোটর লঞ্চে। আর সঙ্গে সঙ্গে সারেং ইয়াকুব মেঘনাদের কথামতো লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে। এগিয়ে চলেছে ডাঙার কাছ ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে।

প্রসেনজিৎ বললেন, মেঘনাদ তোর উদ্দেশ্য কি জটাই সর্দারের দলকে দেখানো যে আমরা ওদের ভয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছি?

মেঘনাদ বললো, সেটা ওকে বোঝাতে পারলে তো ভালই হয়। তবে যে ধূর্ত পর্তুগীজ ওদের সঙ্গে রয়েছে, তাকে বোধহয় এত সহজে বোকা বানানো যাবে না। তাই অন্ততপক্ষে রাত্রিবেলাটাও ওদের নাগালের বাইরে থাকতে পারলে ভাল হয়।

এবার আমি যে প্রশ্নটা করতে চাইছিলাম, সেটাই উচ্চারণ করলেন ইন্সপেক্টর খাঁড়া, আচ্ছা মেঘনাদবাবু, এটা কী ব্যাপার হলো মশাই? আপনাদের যে পর্তুগীজ বন্ধুটিকে জটাই সর্দার সেদিন চড়াও হয়ে বন্দী করে নিয়ে গেল, সে ওদের পাল্লায় পড়ে রাতারাতি নিজেই জলদস্যু হয়ে গেল!

এখন বুঝতে পারছি জটাই সর্দার সত্যি ওকে বন্দী করেনি। ও নিজেই জটাই-এর দলে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে।

সেকি! মেঘনাদের কথায় এবার অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই, এও কি সম্ভব?

সম্ভব যে তা তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি। তবে কি ভাবে তা সম্ভব হলো তা জানতে আমাদের আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে অর্ণব।

কিন্তু........

মেঘনাদ এবার আমায় কথা শেষ করতে না দিয়ে বললো, তবে ব্যাপারটা যে এমনই ঘটেছে সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হয়েছি আজই ভোরবেলায়।

আজই ভোরবেলায়? এবার প্রশ্ন প্রসেনজিৎ মজুমদারের।

হ্যাঁ প্রসেনজিৎ, মেঘনাদ বললো, মনে পড়ছে, জটাই সর্দারের এক চ্যালা আমাদের বিভ্রান্ত করে অন্য পথে নিয়ে যাবার পর আমরা যখন আজ ভোরবেলা আবার ফিরছিলাম, তখন হঠাৎ নদীর মধ্যে একজোড়া ড্রাম ভাসতে দেখেছিলাম?

হ্যাঁ। তাতে বাঁধা ছিল একটা করোটি চিহ্নিত পতাকা।

ঠিক। কিন্তু ওই পতাকা এখানকার কোনো জলদস্যু ব্যবহার করে না। ওই পতাকা ব্যবহার করতো মধ্যযুগের জলদস্যুরা। তারা তাদের জাহাজে ওই পতাকা টাঙিয়ে সাগর-মহাসাগরে লুঠতরাজ করে বেড়াত।

হ্যাঁ। এসব কথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি।

তা হলেই বুঝে দেখ প্রসেনজিৎ, মেঘনাদ বললো, তেমন একটা পতাকাই আমাদের বিদেশী বন্ধুটি সাগর মোহনায় উড়িয়ে রেখে আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল। ওটা দেখেই আমার অনুমান দৃঢ় হয়। আমাদের দেশী জলদস্যুরা ওধরনের পতাকা কোনোদিন ব্যবহার করেনি।

শুনতে শুনতে সত্যিই গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে হার্মাদ কাণ্ডের একটা পরিচ্ছেদ বুঝি চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

চমক ভাঙলো গম্ভীর ভয়ানক বাঘের ডাকে। সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগারের হুঙ্কার। বাঘের এমন ডাক কোনোদিন শুনিনি। মনে হলো বাঘটা খুব কাছ থেকে ডেকে উঠলো— আবার....আবার...! বুকের ভেতরটা ভয়ে গুরু গুরু করে উঠলো।

আমাদের মধ্যে যারা স্থানীয় লোক, এমনকি অসীম সাহসী গাইড নগেন জানাও কপালে হাত ঠেকিয়ে সমস্বরে বলে উঠলো, হে বাবা দক্ষিণ রায়, কৃপা কর বাবা....হে মা বনবিবি, তোমার বাহনকে তুষ্ট রেখো গো.....।

মেঘনাদ বললো, ইয়াকুব, লঞ্চের কোনো আলো যেন না জ্বলে। আজকের রাতটা সবাই সজাগ থাকবে। সাবধান! খুব সাবধান!

আগুন জ্বেলেছে কে

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমরা

সবাই জেগে বসেছিলাম।

গভীর রাতে সুন্দরবনের এই সাগর মোহনায় সে যে কী দৃশ্য তা বলে বোঝানো যাবে না।

অমাবস্যার ঘুটঘুটে রাত। সারা আকাশ জুড়ে অগুনতি তারারা যেন শরতের শিউলি ফুলের মতো ছড়িয়ে আছে। কোথাও কোনো আলো নেই। অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করেছে সাগর অরণ্য। তবে অরণ্য নিস্তব্ধ নয়। মাঝে মাঝেই দূর থেকে শোনা যাচ্ছে হিংস্র নিশাচরদের হুঙ্কার। সেই সঙ্গে নিশাচর পাখিদের কর্কশ ডাক। সাগরও স্তব্ধ নয়। ঢেউ-এর তালে তালে ফুঁসে উঠছে হয়তো কোনো শুশুক বা ছোট হাঙর। ভুস করে মাথা তুলে আবার ডুব দিচ্ছে।

এখানে প্রতিমুহূর্তে মনের মধ্যে জেগে রয়েছে শঙ্কা—জলে হাঙর, ডাঙায় বাঘ ছাড়াও রয়েছে জলদস্যুর আক্রমণের ভয়।

কিন্তু জটাই সর্দারের সেই ভটভটিটাই বা কোথায়? যে জায়গায় সেটা বাঁধা ছিল সেখানেও তো কোনো আলো জ্বলতে দেখছি না। এর অর্থ আমাদের মতো একই কৌশল অবলম্বন করেছে ওই জলদস্যুর দল। ভটভটিতে কোনো আলো জ্বালায়নি। ওরাও ওদের উপস্থিতি আমাদের টের পেতে দিতে চায় না।

এইভাবে অনেকটা রাত কাটলো। তারপর ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। ঘুমিয়ে বোধহয় কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙলো মেঘনাদের হাতের ধাক্কায়, অর্ণব, এ্যাই অর্ণব, ওঠ, উঠে পড়।

তাকিয়ে দেখি চোখের সামনে এক আশ্চর্য দৃশ্য। আকাশ আর সমুদ্র লালে লাল। দেখে মনে হয় রক্তধৌত হয়ে রক্ত সাগরের নিচে থেকে উঠছে নতুন দিনের সূর্য।

তবে কি আমাদের জীবনে এ এক নতুন রক্তাক্ত দিনের সূচনা?

হঠাৎ প্রসেনজিৎবাবুর কণ্ঠস্বর শুনে চমক ভাঙলো—মেঘনাদ, দেখছিস, জটাই সর্দারের ভটভটিটা নেই। ব্যাটা পালিয়েছে।

না, পালায়নি। পাশ থেকে ইন্সপেক্টর খাঁড়া বললেন, নিশ্চয়ই ওখান থেকে সরে গিয়ে অন্য কোথাও ওৎ পেতে রয়েছে।

হ্যাঁ, কথাটার যুক্তি আছে। তাহলে এখন কী করণীয়? আমরা কি সর্বপ্রথমে আমাদের মোটর লঞ্চ নিয়ে মোহনার পাড় ধরে ওদের খুঁজে বেড়াব?

না। মেঘনাদ এককথায় আমার এ প্রশ্নটাকে উড়িয়ে দিল। এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য লুই রিকার্দোর পূর্বপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত একশো বটের ঝুরি নামা সেই ভাঙা মন্দিরের খোঁজ করা।

কিন্তু সত্যিই কি আর তার প্রয়োজন আছে? প্রশ্ন করলাম আমি। কারণ যার অনুরোধে আমরা এ অভিযানে এসেছি সে নিজেই যখন গুপ্তধনের লোভে শত্রু দলের সঙ্গে ভিড়ে গেছে.....

তুই ভুল করছিস অর্ণব, মেঘনাদ আমায় বাধা দিয়ে বললো, আগেও বলেছি গুপ্তধনের প্রতি আমাদের কোনো লোভ নেই, আমরা শুধু চাই সেই চারশো বছর আগের সুন্দরবনের জলদস্যুর ঐতিহাসিক ঘাঁটিটাকে খুঁজে বার করতে। এর একটা দারুণ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

প্রসেনজিৎ মজুমদার বললেন, কিন্তু সে ঘাঁটি যে এখানেই আছে এবং এটাই যে সেই ভাঙাদুনি দ্বীপ, তার কোনো প্রমাণ কিন্তু এখনও আমরা পাইনি মেঘনাদ। কারণ নগেন জানা জায়গাটা এখনও সঠিক চিনতে পারেনি।

না প্রসেনজিৎ, এ ব্যাপারটায় এখন আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। আমরা যেখানে এসেছি সেখান থেকে একশো ঝুরি বটের পুরোনো মন্দিরতলা বোধহয় খুব বেশি দূরে নয়।

শুনে অবাক হলাম। মেঘনাদের এ কথার অর্থ কী?

গতকাল গভীর রাতে ওই জঙ্গলের ভেতরে আমি নিজের চোখে আগুন দেখেছি। মেঘনাদ বললো।

আগুন!

হ্যাঁ অর্ণব। আর তুই জানিস যেখানে আগুন সেখানেই মানুষের সম্ভাবনা। সুন্দরবনের ওই গভীর অরণ্যে মানুষ আসবে কোথা থেকে?

কিন্তু আমি যদি বলি ওখানে আগুন জ্বেলে ঘাঁটি গড়েছে জটাই সর্দার এবং লুই রিকার্ডোর জলদস্যু বাহিনী? ইন্সপেক্টর খাঁড়া ভ্রূ কুঁচকে বললেন।

আমার তা মনে হয় না। মেঘনাদ বলল, ভটভটি ছেড়ে ওই ভয়াল অরণ্যের মাটিতে ঘাঁটি গেড়ে রাত কাটাবে এমন দুঃসাহস জটাই-এর মতো দুর্ধর্ষ জলদস্যুরও হবে না। আর তা সে করবেই বা কেন?

তা হলে আগুন জ্বাললো কে? প্রসেনজিৎবাবু উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করলেন।

তার চেয়েও বড় কথা, আগুন ওখানে যেই জ্বালাক, তা সে অকারণে জ্বালেনি। তবে কারণটা সেখানে না পৌঁছে জানা যাবে না।

ইন্সপেক্টর এবার বললেন, মেঘনাদবাবু ঠিক বলেছেন। সবচেয়ে আগে আমাদের যে কাজটা করা দরকার তা হলো জঙ্গলের মধ্যে ওই আগুনের রহস্য ভেদ করা।

শেষপর্যন্ত সেটাই ঠিক হলো। গতকালের মতো আজও আমাদের দলটা নামবে ডাঙায়। তারপর সদলবলে অরণ্যে ঢুকবো আমরা। গতরাতে অরণ্যের যে দিকে আগুন জ্বলেছিল সেই দিক লক্ষ্য করে চলবো। মেঘনাদের ধারণা জায়গাটা এখান থেকে বেশি না হোক এক-আধ কিলোমিটারের মধ্যে হবে।

কিন্তু গভীর গহন অরণ্যে ওই আধ কিলোমিটার পথ হাঁটার চেয়ে বড় বিপদ আর হয় না। ওখানে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর, গাছে বিষাক্ত সাপ আর পায়ে পায়ে জলদস্যু।

মনে পড়লো আজ ভোরের প্রথম সূর্যোদয়ের দৃশ্যটা—সারা প্রকৃতির রক্ত মন্থন করে পুব আকাশে সূর্য ওঠার ভয়ঙ্কর দৃশ্যপট।

জানি না এ কোন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত!

(চলবে)

ছবিঃ সমীর সরকার

জলদস্যুর গুপ্তধন

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[ভাঙাদুনি দ্বীপ খুঁজে ফিরছে মেঘনাদরা। হঠাৎ তারা দেখল একটা ভটভটি বাঁধা এক দ্বীপে। ওটাই ভাঙাদুনি ভেবে তারা নেমে পড়ল সেখানে। গভীর অরণ্যে জলদস্যু জটাই সর্দারের দলের সঙ্গে লড়াই বাধল ওদের। দস্যুদলকে নির্দেশ দিচ্ছিল মেঘনাদের মক্কেল লুই রিকার্দো। মেঘনাদ অবাক হয়ে ভাবে এটা কী করে সম্ভব! সন্ধ্যা হতেই সকলে ফিরে এল লঞ্চে। রাতে জঙ্গলে দেখা গেল আগুনের আভা। কে ওখানে? জটাই না আর কেউ? সে রহস্য ভেদ করতেই পরদিন আবার দ্বীপে এল মেঘনাদ। চলল আগুন যেখানে জ্বলছিল তার উদ্দেশে।]

ফাঁদ

আমরা সাতজন মানুষ এগিয়ে চলেছি সুন্দরবনের নিষিদ্ধ এলাকায় ঘোর জঙ্গলের মধ্যে। সময় এখন সকাল, কিন্তু সুন্দরবনের এই ঘন জঙ্গলে এখনও জমে আছে ছায়াচ্ছন্নতা। আশপাশে অদ্ভুত গড়ন সব গাছগাছালি। এক একটা জায়গায় অরণ্যের এমন ঠাসবুনুনি, যেখানে মাটিতে সূর্যের আলো নেমে আসতে পারে না। আমরা সবাই সশস্ত্র। বুকে-পিঠে বর্ম। অনেকটা কলকাতা পুলিশের দাঙ্গা দমন বাহিনীর মতো। হালকা ফাইবার গ্লাসের। এছাড়া আমাদের সকলের মাথায় হেলমেট তো আছেই। আর একটা জিনিসও সঙ্গে নিয়েছি আমরা। মাথায় উল্টো করে পরা রবারের মুখোশ। উল্টো করে পরা কেন? কারণ বাঘ যদি আক্রমণ করতে আসে পেছনদিকে উল্টো-মুখোশ দেখে সামনে
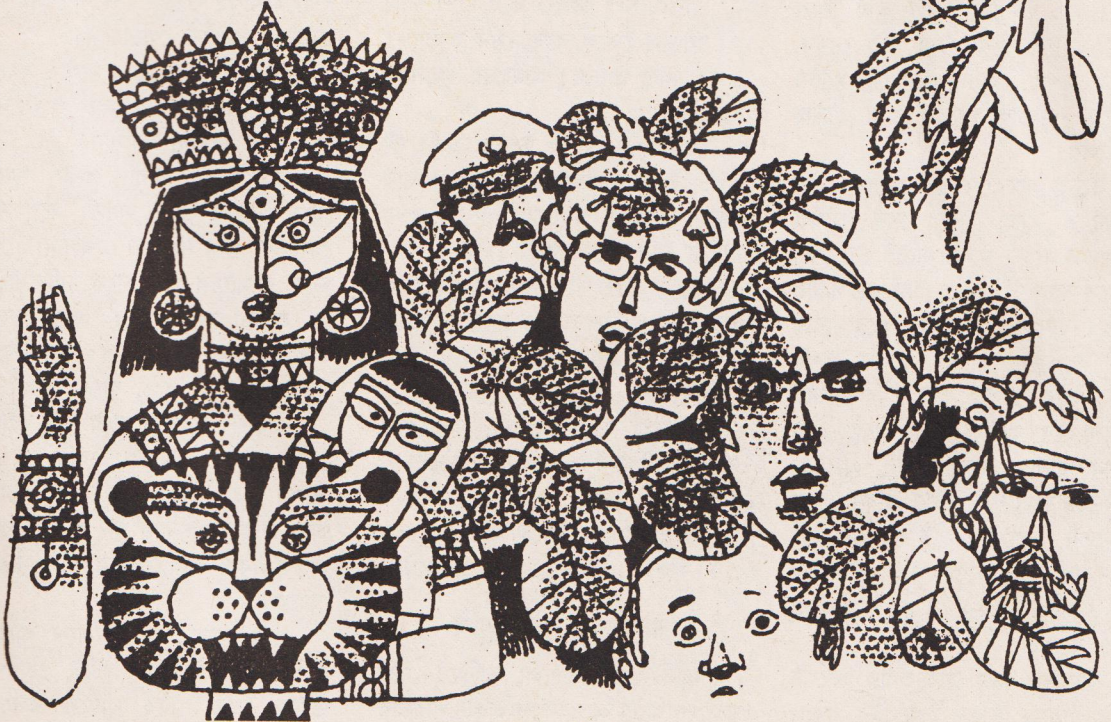
মনে করবে। বাঘের স্বভাবই হলো তারা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে ভালবাসে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রত্যেকের মাথায় উল্টো মুখোশ থাকায় বাঘ আমাদের আসল মুখ কোনদিকে বুঝতে পারবে না। এককথায় আমরা প্রত্যেকেই এখন এক একজন জীবন্ত বাঘ-তাড়ুয়া।

সব মিলিয়ে সুন্দরবনের বাঘ এবং জলদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যবস্থা পাকা। কিন্তু এত কিছু করেও শেষরক্ষা হবে তো?

দেখতে দেখতে সামনে একটা খালের মতো পড়লো। জল সেখানে বেশি নেই। তবে কাদা রয়েছে। ওটা আমাদের পার হতে হবে।

মেঘনাদ বললো, সকলে সাবধান। এই সব জায়গায় সাধারণত বাঘ জল খেতে আসে।

ঠিক বলেছিস। পাশ থেকে বললেন প্রসেনজিৎবাবু, আর ওই যে দেখছিস খেজুর গাছের মতো পাতা, শুকনো হলুদ আর কাঁচা সবুজ রঙের—ওই হলো সুন্দরবনের হেঁতাল। ওই হেঁতালের ঝোপই বাঘের নিশ্চিন্ত আশ্রয়....

শুনতে শুনতেই 'আঁই আঁই' করে উঠলেন ইন্সপেক্টর খাঁড়া, ওই দেখুন, দেখুন মশাই, খাদের ওধারে মাটির ওপরে পরিষ্কার পায়ের ছাপ রয়েল বেঙ্গলের।

শুনেই আমরা থমকে গেলাম। তবে আমাদের মধ্যে সুন্দরবনের আসল বিশেষজ্ঞ নগেন জানা মোটেই ভয় পেল না। সে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল জায়গাটার কাছে। তারপর বললো, দারোগাবাবু ঠিক বলেছেন, বাঘের থাবার ছাপই বটে। তবে ছাপটা অন্তত একদিনের পুরনো হবে। বলতে বলতে একটু হেসে নগেন জানা বললো, হুজুর, এসময়ে আমাদের দলে যদি জুরান গুণিন ঠাকুর থাকতেন, কোনো চিন্তাই থাকতো না। এমন মন্ত্র ঝেড়ে দিতেন এ তল্লাটের সব বাঘ একদিনের জন্যে বেড়াল হয়ে ম্যাঁও ম্যাঁও করতো।

নগেনের কথা শেষ হবার আগেই তাকে দাবড়ে দিলেন ইন্সপেক্টর খাঁড়া। ভেংচে উঠে বললেন, থাক, আর ম্যাঁও ম্যাঁও করতে হবে না। জুরান গুণিন! হ্যা! যে কম্ম লোকটা এখান থেকে করে গেল তার জন্যে গাঁয়ে পালিয়ে গিয়েও লোকটাকে বেমক্কা প্রাণ দিতে হলো।

কথাটা সত্যি। জুরান গুণিনের ব্যাপারটা এখনও আমাদের কাছে রহস্য হয়েই আছে। একমাস আগে লুই রিকার্দোর ছোট ভাইকে নিয়ে সে এ জঙ্গলে ঢুকেছিল। তারপর এমন কী ঘটলো যাতে সে পর্তুগীজ লোকটার নকশা নিয়ে ফিরে গেল নিজের গাঁয়ে! তবে কি সত্যিই সে গুপ্তধনের লোভে ফ্রান্সিস রিকার্দোকে বাঘের মুখে ফেলে খুন করেছিল? তাহলে সে নিজে গুপ্তধনের সন্ধান না করেই ফিরে গেল কেন? বিশেষত গুপ্তধনের নকশাটা সে যখন পেয়েই গিয়েছিল।

এসব ভাবতে ভাবতে আমরা আবার বাদাবনের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছি। এখানে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। কেমন যেন একটা গা-ছমছমে ভাব।

মেঘনাদ আমার পাশে পাশে হাঁটছিল, হঠাৎ ও ফিস ফিস করে বললো, অর্ণব, আমার কিন্তু ভালো বোধ হচ্ছে না।

তার মানে? আমার কণ্ঠে চাপা ভয়।

আড়াল থেকে কারা যেন আমাদের ওপর নজর রাখছে। আমাদের অনুসরণ করছে।

মেঘনাদের কথার উত্তরে আমি কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আর সময় পেলাম না। আচমকা পায়ের তলার মাটিটা যেন সরে গেল।

হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম মাটি থেকে অনেক নিচে বিশাল এক গহ্বরের মধ্যে। শুধু আমি নই, মনে হলো আমাদের পুরো দলটাই।

আর সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে কারা যেন গগনবিদারী কণ্ঠে অট্টহাসি করে উঠলো—হাঃ......হাঃ......হাঃ......হাঃ........।

সে অট্টহাসির দমকে মাথাটা ঘুরতে শুরু করলো। আমি চেতনা হারালাম।

জলদস্যুর মুখোমুখি

জ্ঞান যখন ফিরলো তাকিয়ে দেখি জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটা পরিষ্কার জায়গায় গাছের সঙ্গে দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার অন্য সঙ্গীদেরও আমারই মতো অবস্থা। আর আমাদের ঠিক সামনে বন্দুক হাতে মূর্তিমান যমের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই ব্যক্তি। একজন কৃষ্ণাঙ্গ অন্যজন শ্বেতাঙ্গ।

দুজনকেই আমরা চিনি। কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি সুন্দরবনের ত্রাস জলদস্যু জটাই সর্দার আর শ্বেতাঙ্গ লোকটি হার্মাদ পেড্রো রিকার্দোর বর্তমান বংশধর লুই রিকার্দো। রক্তের ধারা কি বংশ-পরম্পরায় এইভাবেই বয়ে চলে?

মিঃ মেঘনাদ ভরদ্বাজ, তুমি আমার সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় হেরে গেছ। বীভৎস হাসি হেসে লুই রিকার্দো কথাগুলো ইংরাজীতে বললো। তার কথার ভঙ্গিতে আশপাশের দস্যুরাও হা হা শব্দে হেসে উঠলো।

জটাই সর্দারও এবার তার সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠ মিলিয়ে বললো, বাবু, আপনারা শহরের লোক, কী দরকার ছিল নিজেদের জান বাজি রেখে আমাদের পিছু ধাওয়া করা? এখন কে আপনাদের বাঁচাবে বাবু? গুপ্তধন তো পাবেনই না, জানটাও এখানে খোয়াবেন।

চুপ কর। এ অবস্থার মধ্যেও ধমকে উঠলো মেঘনাদ, আমরা গুপ্তধনের লোভে এ জঙ্গলে আসিনি।

আঁ! শুনেই আবার কর্কশ গলায় হেসে উঠলো জটাই সর্দার, সঙ্গে কণ্ঠ মেলালো অন্য দস্যুরা। দেখলাম ওদের মধ্যে আমাদের ভুল পথে চালিয়েছিল যে লোকটা সেও রয়েছে। এখন অবশ্য তার চালচলন বদলে গেছে। গায়ে ফতুয়া মালকোচা পরা ধুতি, হাতে টাঙ্গি।

বদমাশ! একবার ছাড়া পাই জটাই, তোদের সব কটাকে এবার গারদে ভরবো। এই সংরক্ষিত জঙ্গলে ঢোকা আর জুরান গুণিনকে খুন করার দফায় অন্তত একুশ বছর জেলের ঘানি ঘোরাব তোকে।

শুনে আবার হা হা শব্দে ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠলো জটাই, তারপর ভাঁটার মতো চোখ ঘুরিয়ে বললো,

তুমাদের মুরোদ আমার জানা আছে গো দারোগাবাবু। তুমি আমায় অনেক নাকাল করেছ, এবার সুদে আসলে শোধ তুলবো।

আর কথায় কাজ কি জটাই, জটাই সর্দারের কথার মধ্যেই লুই রিকার্দো ভয়ানক কণ্ঠে বলে উঠলো, উহাদের খতম কর। আমাদের সব কাজ আজকের মধ্যেই সমাপ্ত করিতে হইবে। ভাঙা বাংলায় কথাগুলো বলতে বলতে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা তুলোট কাগজের মতো কি একটা বার করলো লুই রিকার্দো। সম্ভবত ওটাই ওর পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের নকশা।

ঠিক বলেছ সাহেব, জটাই সর্দার লুই রিকার্দোর হাতের সেই তুলোট কাগজটির দিকে একবার লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, সন্ধ্যের আগেই আমাদের এখানকার কাজ শেষ করে পালাতে হবে। তারপর তো এই বনের 'তেনারা' দলে দলে বেরুতে শুরু করবেন।

জটাই-এর কথার মনে বুঝলাম। এও বুঝলাম আমাদের জীবন শেষ হতে আর দেরি নেই। ওই জলদস্যুর দল ইতিমধ্যেই আমাদের ফাঁদ পেতে বন্দী করেছে, এরপর প্রত্যেককে বেঁধে রেখেছে এক একটা গাছের সঙ্গে। এ অবস্থায় আমাদের বাঁচার আর উপায় কী?

হায়! আমাদের জীবনের শেষ পরিণতি এইভাবেই ঘনিয়ে এল।

বুকের ভেতর থেকে একটা তীব্র হাহাকার বুঝি দীর্ঘশ্বাসের মতো বেরিয়ে এল।

লুই রিকার্দো তার সঙ্গীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বললো, আমি তিন গুনিলেই তুমরা গুলি চালাইবে। গুলি করিয়া ফুটো করিয়া দিবে ওই সাতটি লোকের মাথার খুলি। আমাদের পিছু লইবার চরম শাস্তি উহারা পাইবে।

হায়! ওই অবস্থার মধ্যেও না ভেবে পারলাম না যে মূলত এই বিশ্বাসঘাতক বিদেশী অতিথিটিকে জলদস্যু জটাই সর্দারের কবল থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমরা জটাই-এর পিছু নিয়েছিলাম। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

লুই রিকার্দো গুনতে শুরু করেছে—

এক...দুই...

কিন্তু তার কণ্ঠে তিন সংখ্যাটি উচ্চারিত হবার আগেই কোথা থেকে একটা তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ ভেসে এল—

আর তারপরই চোখের সামনে এক রোমহর্ষক দৃশ্য!

পেছনের জঙ্গল থেকে চকিতে লাফ মেরে বেরিয়ে এল এক বিশাল রয়াল বেঙ্গল টাইগার। থাবা তুলে দাঁড়ালো লুই রিকার্দোর বুকের ওপর।

এমন অভাবিত দৃশ্য কেউ কোনোদিন দেখেনি। ভাবতেও পারে না।

ওই অবস্থাতেই ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠলো বাঘটা।

লুই রিকার্দো যেন স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে। দু'চোখ বিস্ফারিত। মনে হচ্ছে ওই অবস্থাতেই সে জ্ঞান হারিয়েছে।

অন্য জলদস্যুদের অবস্থাও তথৈবচ। ব্যতিক্রম একমাত্র জটাই সর্দার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে বিহ্বলতা কাটিয়ে ফেললো। তারপর পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে তাক করলো বাঘের দিকে।

কিন্তু তার হাতের বন্দুক থেকে গুলি বেরুবার আগেই আর একটা গুলির আওয়াজ হলো, গুড়ুম। আর তারপরই জটাই সর্দারের হাতের বন্দুক পড়ে গেল মাটির ওপর।

শব্দ লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখলাম ওধারের জঙ্গলের ভেতর থেকে এক ব্যক্তি এগিয়ে আসছে।

এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ। মাথার চুলে জটা পড়ে গেছে। পরনে একটা আধময়লা ছেঁড়া জিনসের প্যান্ট আর বুশশার্ট। হাতে উদ্ধত বন্দুক। বুঝতে পারলাম গুলি করে জটাই সর্দারের হাতের বন্দুক এই আগন্তুকই মাটিতে ফেলেছে।

কিন্তু কে? কে ওই আগন্তুক?

আপনিই তো লুই রিকার্দো? পাশ থেকে হঠাৎ মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হলাম।

ওই লোকটি লুই রিকার্দো! তাহলে

যাকে আমরা এতদিন লুই রিকার্দো বলে জানতাম, যে আমাদের অতিথি বন্ধু থেকে রাতারাতি শত্রুতে পরিণত হয়েছে, সেই লোকটি কে?

ও লুই রিকার্দোর ছোট ভাই ফ্রান্সিস রিকার্দো। তাই না মিঃ লুই?

মেঘনাদের কথার উত্তরে এবার আগন্তুক তার ভাই-এর দিকে একবার তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক তাই। ও আমাদের পূর্বপুরুষ জলদস্যু পেড্রো রিকার্দোর রক্তধারারই বাহক হয়েছে। বলতে বলতে আসল লুই রিকার্দো মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আশা করি আপনিই মিঃ মেঘনাদ ভরদ্বাজ? এদেশের সেরা রহস্যভেদী, অন্তত ওয়েবসাইট মারফৎ আমি তেমন বার্তাই জেনেছি।

মেঘনাদ বললো, আমি রহস্যভেদী মেঘনাদ ঠিকই, তবে এদেশে আমার চেয়েও অনেক দুঃসাহসী মানুষ আছে। কিন্তু ওসব কথার আগে যদি আমাদের হাতের বন্ধনগুলো খুলে দেন বাধিত হবো।

নিশ্চয়ই, বলে প্রথমেই ওই জলদস্যুবাহিনীকে একটা ধমক লাগালেন মিঃ লুই রিকার্দো। পরিষ্কার বাংলায় বললেন, যাদের হাতে বন্দুক বা অস্ত্র আছে মাটিতে ফেলে দাও। কেউ যদি এতটুকু চালাকির চেষ্টা কর, আমার বন্দুকের গুলিতে না হলে আমার পোষা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের থাবায় প্রাণ হারাবে।

বলতে বলতে ওদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মিঃ লুই রিকার্দো সর্বপ্রথমে মেঘনাদের হাতের বাঁধনটা খুলে দিলেন। এরপর অন্যদের বন্ধন মোচন হতেও দেরি হলো না।

আমরা যে যার অস্ত্র তুলে নিয়ে দাঁড়ালাম। অবস্থাটা পাল্টে গিয়ে এবার আমরা হলাম শিকারী আর ওই জলদস্যুরা আমাদের শিকার।

আমরা যে যার পজিশান মতো বন্দুক তাক করে দাঁড়াবার পর নতুন আগন্তুক আসল লুই রিকার্দো শিস দিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল রয়াল বেঙ্গল টাইগার ফ্রান্সিসের বুকের ওপর থেকে তার থাবা নামিয়ে ধীরে ধীরে লুই রিকার্দোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো—যেন একটা পোষা অ্যালসেশিয়ান কুকুর।

লুই সুন্দরবনের সেই হিংস্রতম প্রাণীটির মাথায় পরম স্নেহভরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, তোমরা কেউ কোনো চালাকির চেষ্টা না করলে আমার 'বেবি' তোমাদের কাউকে কিছু বলবে না। কিন্তু একটু বেচাল হলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি ছিঁড়ে নিতে দেরি করবে না। আশা করি সুন্দরবনের বাঘের ক্ষমতা আমার চেয়েও তোমরা বেশি জান।

'বেবি'ই বটে! সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগারকে বেবি সম্বোধন করতে বোধহয় আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন শোনেনি।

এ অবস্থায় জটাই সর্দারের দস্যু দলের দশা সহজেই অনুমেয়। এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ওরা সবাই কথা বলার শক্তিই বোধহয় হারিয়ে ফেলেছে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ওরা। আর লুই রিকার্দোর ভাই ফ্রান্সিস ধপ করে বসে পড়ে মাটির ওপরে। এতক্ষণ ওর বুকের ওপর থাবার ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রয়াল বেঙ্গল টাইগার। এ চরম উত্তেজনা এবং ভীতি আর সে সহ্য করতে পারে না।

লুই রিকার্দো তার ভাই-এর দিকে তাকিয়ে তীব্র ধিক্কারভরা কণ্ঠে বললেন, কুলাঙ্গার! বিশ্বাসঘাতক! তুই যে কাজ করেছিস তাতে আমাদের পূর্বপুরুষরা এত প্রজন্ম ধরে যে সুনাম অর্জন করেছিল তা সব নষ্ট হলো। বুঝতে পেরেছি তোর মধ্যে জেগে উঠেছে পেড্রো রিকার্দোর আত্মা। কিন্তু আমাদের বংশের এক গ্র্যান্ডমা বিনোদিনীর অভিশাপ তোকে ধ্বংস করবে। এখনও সময় আছে তুই তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

ফ্রান্সিস কিন্তু তার দাদার কথার কোনো জবাব দিল না। তার দু'চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো তীব্র জিঘাংসা। কোনো অনুতাপের লক্ষণই সেখানে নেই।

লুই রিকার্দো বললেন, মেঘনাদবাবু, আমি আপনাদের সব কথা বলতে চাই। তবে এখানে নয়। আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।

কিন্তু এই শয়তানগুলোর কী হবে? এতক্ষণে পুলিশি মেজাজ ফুটে বেরুলো ইন্সপেক্টর খাঁড়ার কণ্ঠ থেকে।

এদের পাহারা দেবার জন্যে আমার বেবি তো রইলোই। আপনাদের গার্ডরাও না হয় থাকুক। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ফিরে আসবো। তারপর এদের ব্যবস্থা করা যাবে।

এই শয়তানদের বিশ্বাস নেই। এদের এমনি রাখলে চলবে না। ইন্সপেক্টর খাঁড়া তাঁর গার্ডদের নির্দেশ দিলেন, অ্যাই, তোমরা এদের হাতগুলো এক একটা গাছের সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধ, ঠিক যেমনভাবে ওরা আমাদের বেঁধেছিল।

হুকুম তামিল হলো। এরপর সেই বন্দী দস্যুদের পাহারায় এক রয়াল বেঙ্গল টাইগার এবং জনাকয়েক গার্ডকে রেখে আমরা অনুসরণ করলাম লুই রিকার্দোকে।

এই গহন অরণ্যে উনি আমাদের কোথায় কী দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন? তবে কি ওঁর পূর্বপুরুষ জলদস্যু পেড্রো রিকার্দোর রেখে যাওয়া গুপ্তধন সত্যিই উনি খুঁজে পেয়েছেন? নাকি আরো কোনো রহস্য আছে এই জঙ্গলের মধ্যে ওনার এভাবে একা থেকে যাওয়ার পেছনে!

এটুকু সময়ের মধ্যে মানুষটাকে যতটুকু দেখেছি অবাক হয়েছি। সুন্দরবনের হিংস্র বাঘকে যে মানুষ এক মাসের মধ্যে বশ করতে পারেন, তিনি কি জাদুকর? আর গতরাতে মেঘনাদ মোটর লঞ্চ থেকে জঙ্গলের মধ্যে যে আগুন দেখেছিল তা কি ওঁরই জ্বালানো?

লুই রিকার্দোকে অনুসরণ করতে করতে এই কথাগুলোই ভাবছিলাম।

(চলবে)

ছবি ঃ সমীর সরকার

জলদস্যুর গুপ্তধন

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[দস্যুদলের খোঁজে এসে মেঘনাদরা ধরা পড়ল তাদের পাতা ফাঁদে। জ্ঞান ফিরতে দেখে সকলে গাছের সঙ্গে বাঁধা। দস্যুরা বন্দুক তুলল ওদের গুলি করতে আর তখুনি পোষা বাঘকে নিয়ে আবির্ভূত হলেন আসল লুই রিকার্দো। উদ্ধার পেল মেঘনাদরা, ধরা পড়ল দস্যুরা। কিন্তু এতদিন কোথায় ছিলেন লুই? সেই রহস্যের কথা জানাতেই কি নিজের ডেরায় লুই নিয়ে চললেন রহস্যভেদীকে?]

আশ্চর্য ইতিহাস

আমরা সবাই নীরবে হেঁটে চলেছি। সবাই বলতে মেঘনাদ, ইন্সপেক্টর খাঁড়া, প্রসেনজিৎবাবু, নগেন জানা, আমি আর আমার সামনে লুই রিকার্দো। এখন শুধু ঝরা পাতার ওপর হেঁটে চলার খস খস শব্দ।

কিছুটা পথ অতিক্রম করে আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। আমাদের পাশ থেকে নগেন জানা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, হুজুর, এটাই সেই জায়গা।

আশপাশে কিছু ঢিবি এবং বহু পুরনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো রয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য হলো এই ভগ্ন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটা বিশাল বটবৃক্ষ। অসংখ্য ঝুরি নেমে এসেছে তা থেকে। এক একটা ঝুরি এত মোটা যে সেগুলিকেই গাছের কাণ্ড বলে ভ্রম হয়। ওর মধ্যে আসল কাণ্ড যে কোনটি তা বোঝা খুবই দুষ্কর। ওই ঝুরিওলা বিশাল বটবৃক্ষ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে একটা ভগ্ন মন্দিরকে। বলতে কি ওই ছোট্ট মন্দিরটিকে মনে হচ্ছে ওই বটবৃক্ষের কাণ্ডেরই গর্ভ।
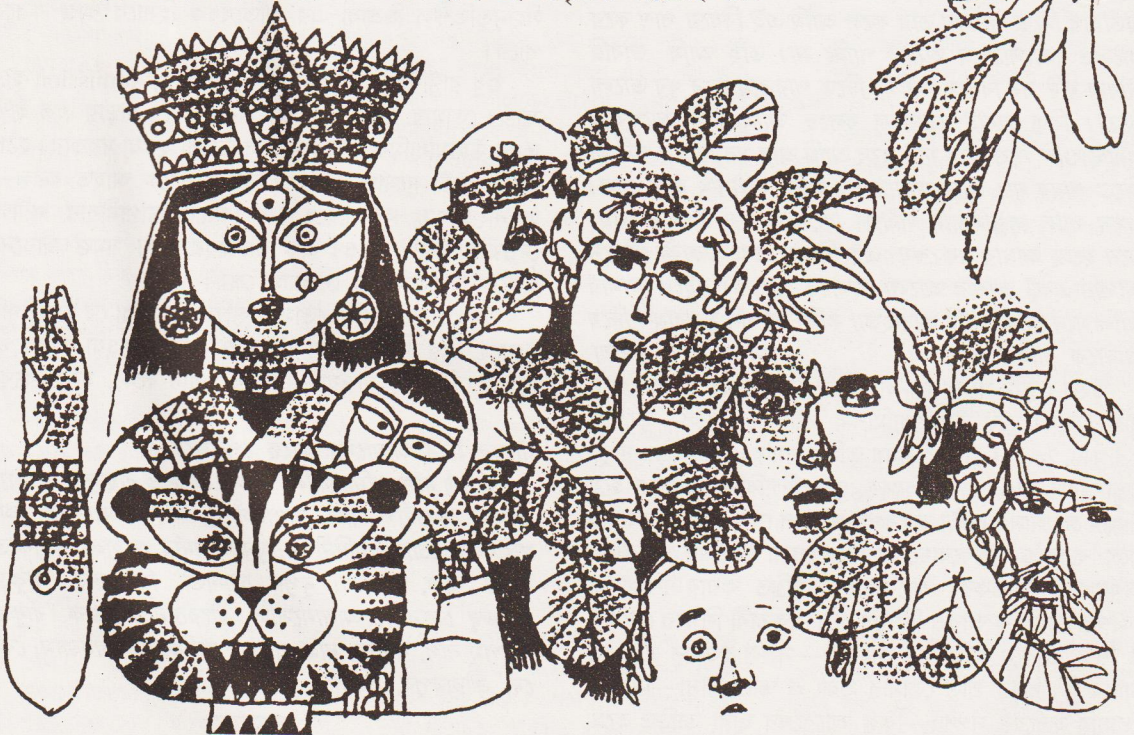
আর বোধকরি এ কারণেই মন্দিরের গর্ভগৃহটি এখনও অটুট রয়েছে।

আমরা এগিয়ে গেলাম মন্দিরের দিকে। মন্দিরের ভেতরে একটি কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। আশ্চর্য! শিবলিঙ্গের মাথায় চাপানো রয়েছে কয়েকটি টাটকা বনফুল। এই ঘোর অরণ্যে কে এই মন্দিরে পুজো করে?

আমাদের পথপ্রদর্শক শিবমন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর জোড় হস্তে মাথা নিচু করে প্রণাম জানালেন বিগ্রহকে।

তবে কি এই বিদেশী মানুষটিই.....

হঠাৎ লুই রিকার্দো ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর আমাদের সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, আপনারা এখানে এসে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে গেছেন, হয়তো আমায় পাগল ভাবছেন।

না মিঃ লুই। পাগল কখনও সুন্দরবনের বাঘকে এমন ভাবে পোষ মানাতে পারে না। আমি আগেই আপনার সম্পর্কে জেনেছিলাম যে আপনি শুধু একজন প্রত্নতত্ত্ববিদই নন, আপনি একজন যথার্থ পশুপ্রেমী, আন্তর্জাতিক বন্যপশু সংরক্ষণ সমিতির সদস্য এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড (W.W.F.)-এর সঙ্গে যুক্ত। শুধু তাই নয়, আপনি যে এককালে বিখ্যাত এক সার্কাসে রিংমাস্টার ছিলেন সে খবরও আমি যোগাড় করেছি।

এসব শুনতে শুনতে এবার শুধু লুই রিকার্দোই নন, আমরা সবাই অবাক হয়ে মেঘনাদের দিকে তাকালাম। লুই সম্পর্কে এতসব খবর এর মধ্যে ও যোগাড় করলো কখন!

সাবাস! লুই রিকার্দো হাসিমুখে মেঘনাদের দিকে তাকালেন, আমি যে ইন্টারনেট মারফৎ এদেশের ঠিক লোকের সঙ্গেই যোগাযোগ করেছিলাম তা এতক্ষণে বুঝতে পারছি। তবে ওই যে বন্য প্রাণীর কথা বললেন, এ সম্পর্কে একটা কথাই আমি বলতে পারি, পৃথিবীর কোনো হিংস্র জন্তুই মানুষের চেয়ে হিংস্র নয়। আর যথার্থ ভালোবাসার স্পর্শ পেলে বনের বাঘও বশ মানে। আমার 'বেবি'-কেও সেভাবেই আমি বশ মানিয়েছি। এই জঙ্গলে ও আহত হয়ে পড়েছিল। আমি চিকিৎসা করে ওকে সুস্থ করেছি, তারপর ভালোবাসা আর কৌশলের জোরে বনের বাঘকে যে বন্ধু বানাতে পেরেছি তা তো আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পেলেন। বলতে বলতে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠলো লুই রিকার্দোর ঠোঁটের ফাঁকে।

কিন্তু মিঃ লুই, মেঘনাদ আবার প্রসঙ্গে ফিরলো, আপনি কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেও আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেননি। আর সে কারণেই এদেশে এসে যখন আমার সঙ্গে দেখা হলো না তখন আর অপেক্ষা না করে সরাসরি চলে এসেছিলেন সুন্দরবনে। আর তার ফলেই যত কিছু অঘটন।

লুই রিকার্দো একটু লজ্জা পেলেন। কয়েক সেকেন্ড মাথা নিচু করে থেকে বললেন, আপনি আমায় দোষারোপ করতেই পারেন মিঃ ভরদ্বাজ, কিন্তু তাড়াহুড়ো না করেও আমার উপায় ছিল না।

কারণটা কি আপনার ওই কুলাঙ্গার ভাই ফ্রান্সিস?

ঠিক বলেছেন। ইন্সপেক্টর খাঁড়ার কথায় মাথা নাড়লেন লুই রিকার্দো। যে মহৎ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে পেড্রো রিকার্দো একদিন নিজের জীবন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছিলেন সব কলঙ্ক, চারশো বছর পর সেই কলঙ্ক আবার ছায়া ফেলেছে তাঁরই এক বংশধরের উপর। তার শিরায় শিরায় ফের জেগে উঠেছে জলদস্যুর বিষাক্ত রক্তের ধারা। বলে মেঘনাদের দিকে তাকান লুই রিকার্দো। ফ্রান্সিস কী গর্হিত কাজ করেছে জানেন?

বোধহয় কিছুটা অনুমান করতে পারি, মেঘনাদ বললো, সে যখন আপনার পূর্বপুরুষের ইতিহাস এবং সুন্দরবনের এই হার্মাদ ঘাঁটির কথা জানতে পারলো, তখন থেকেই সে লুব্ধ হয়ে উঠলো। তার ধারণা হলো এখানে পূর্বপুরুষের বিশাল ধন-সম্পদ লুকোনো আছে। তারপর সে যখন জানলো সেই ঘাঁটির একটা ম্যাপ আপনি পেয়েছেন, তখন সে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

ঠিক বলেছেন মিঃ ভরদ্বাজ। সে প্রথমে আমাকে খুন করে ম্যাপটা নেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেটা সুবিধে হলো না। আমি তার চোখে ধুলো দিয়ে প্রথমে আপনাকে ই-মেল বার্তা পাঠালাম, তারপর আর অপেক্ষা না করে সোজা চলে এলাম কলকাতায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেখা পেলাম না। আমার আর তখন অপেক্ষা করার সময় ছিল না। কারণ ফ্রান্সিস আমায় অনুসরণ করতে শুরু করেছে। বাধ্য হয়ে আমি একাই গেলাম সুন্দরবন এলাকার এক গাঁয়ে। সেখানে খোঁজ পেলাম গুণিন জুরানের। সে এই জায়গাটা ভালোভাবে চেনে।

এদিকে আপনার ভাই ফ্রান্সিস তখন আপনার পরিচয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলো এবং আমাদেরই গাইড হিসেবে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবন এলাকায় ঢুকলো, তাই তো? বললাম আমি।

মেঘনাদ বললো, কিন্তু অর্ণব, মানুষ তার নিজের স্বভাব লুকোবার যতই চেষ্টা করুক, বরাবরের জন্যে তা পারে না। ফ্রান্সিসও পারেনি। আর সে কারণেই ফ্রান্সিস তারই সমগোত্রীয় জলদস্যু জটাই সর্দারকে পেয়ে আমাদের ছেড়ে তার দলের ওপর ভরসা করলো।

ইন্সপেক্টর খাঁড়া এতক্ষণ চুপচাপ সব কিছু শুনছিলেন। এবার বললেন, রীতিমতো নাটকীয় ঘটনা মশাই। কিন্তু আপনি সেই জুরান গুণিনকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে মোটেই ভালো কাজ করেননি লুই সাহেব। আপনার নিজের ভাই আপনার যা ক্ষতি করতে পারেনি, সে ব্যাটা তাই করেছে। এই জঙ্গলে আপনাকে একা ফেলে আপনার গুপ্তধনের ম্যাপটা নিয়ে পালিয়ে গেছে সময়মতো নিজেই এসে তা দখল করবে বলে। এজন্যে অবশ্য উপযুক্ত শাস্তি তার হয়েছে।

না ইন্সপেক্টর, জুরান গুণিনও আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। আসলে ঈশ্বর যাকে যা দিতে চান, মানুষের সাধ্য কি তা থেকে তাকে বঞ্চিত করে? লুই রিকার্দো কেমন যেন অদ্ভুত হেঁয়ালি ভরে কথাগুলো বললেন।—এখানে এসে আমি যে সম্পদ পেয়েছি, যে অনুভূতি লাভ করেছি, তা আগে কোনোদিন পাইনি।

আপনি কি আপনার পূর্বপুরুষের সেই গুপ্তধনের কথা বলছেন? এবার প্রসেনজিৎবাবু নীরবতা ভাঙলেন।

গুপ্তধন! হ্যাঁ, গুপ্তধনই বটে, লুই রিকার্দোর ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত হাসি খেলে গেল। তারপর বললেন, আপনারা
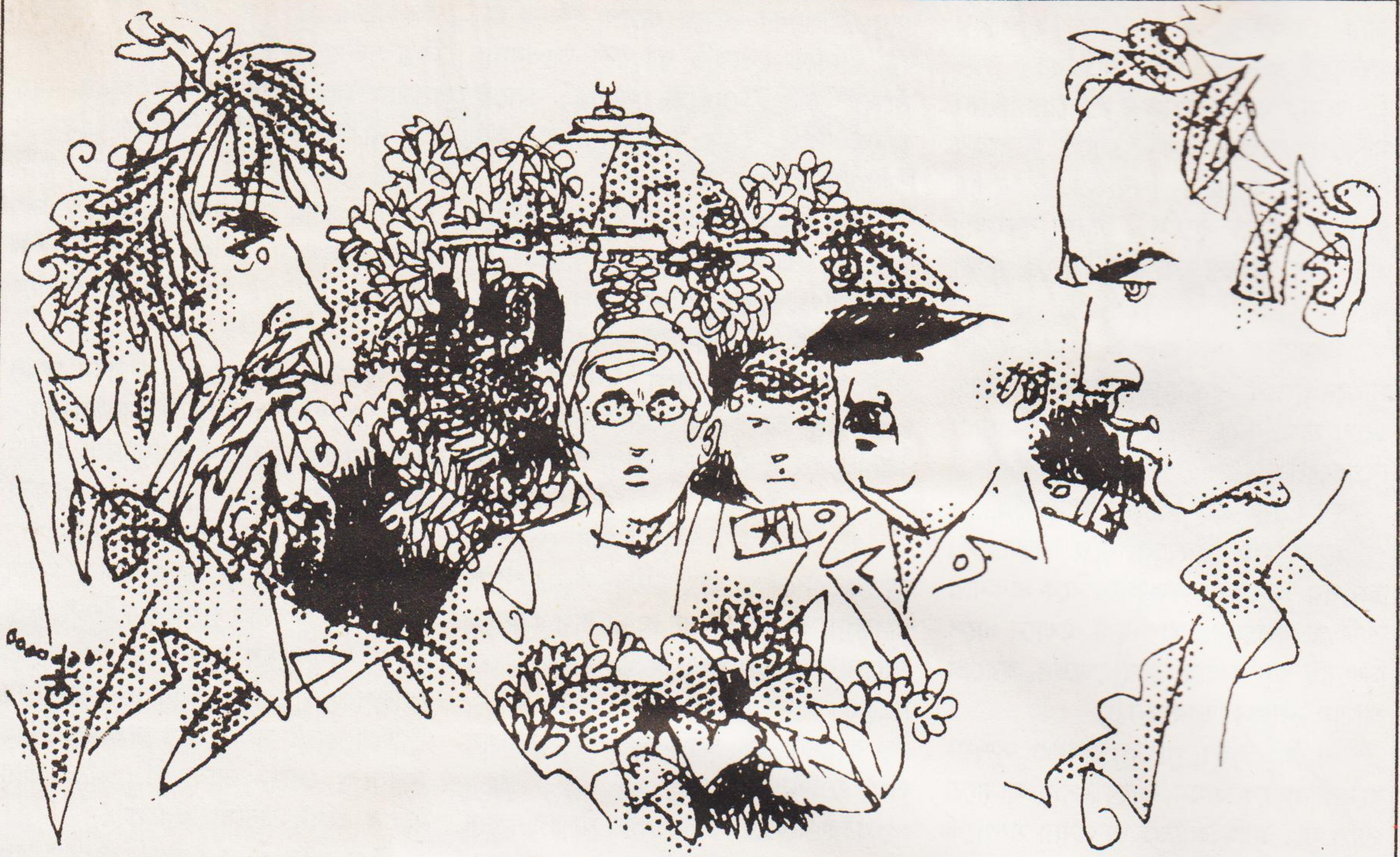
ফ্রান্সিস কী গর্হিত কাজ করেছে জানেন?

দেখতে চান আমার পূর্বপুরুষের সেই মহা সম্পদ, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন? তাহলে আসুন আমার সঙ্গে। এই ভগ্ন মন্দিরের পেছনে....

বলতে বলতে তিনি আবার হাঁটতে শুরু করলেন। আমরাও অনুসরণ করলাম।

গুপ্তধনের সন্ধান

ভগ্ন শিবমন্দিরের পেছনে অনেক ভাঙাচোরা ইমারতের টুকরো, মাটির ঢিবি। তার পাশে সদ্য তৈরি করা একটা ছোট্ট কুটির।

লুই রিকার্দো মাথা নিচু করে কুটিরের মধ্যে ঢুকলেন। কিন্তু কুটিরের মধ্যে আমাদের পাঁচজনের স্থান সংকুলান হওয়া মুশকিল। তাই মেঘনাদ আর প্রসেনজিৎবাবু ঢুকলেন, বাকি আমরা তিনজন কুটিরের দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

কুটিরের ভেতরটা অন্ধকার। মেঘনাদ তার হাতের টর্চ জ্বাললো। ভেতরটা আলোকিত হয়ে উঠলো। কুটিরের মেঝে মাটির কিন্তু ঠিক মাঝখানে কী একটা দেখা যাচ্ছে। প্রসেনজিৎ মজুমদার বললেন, এখানেই কি আছে আপনার পূর্বপুরুষের গুপ্ত ভাণ্ডারে প্রবেশের পথ?

লুই রিকার্দো কথা শুনে হাসলেন। বললেন, কিছু ভুল বলেননি মিঃ মজুমদার। তবে আমার পূর্বপুরুষ এখানে যা রেখে গেছেন তা তাঁর সারাজীবনে লুণ্ঠিত সব সম্পদের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান।

কথাটা কেমন যেন হেঁয়ালি বলেই মনে হলো। মিঃ লুই কি বলতে চাইছেন?

লুই রিকার্দো আর একবার আমাদের সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এই কুটিরের ঠিক মাঝখানটা দেখতে পাচ্ছেন?

ফুলে ঢাকা ওটা কি কোনো সমাধি? প্রশ্নটা মেঘনাদ করলো।

হ্যাঁ মিঃ ভরদ্বাজ। ওটা একটা সমাধি। চারশো বছর আগে ঠিক ওই জায়গাতেই আমাদের বংশের কোনো এক বিনোদিনী রিকার্দোকে দাহ করে আমার পূর্বপুরুষ পেড্রো রিকার্দো তাঁর একটা সমাধি বানিয়ে রেখেছিলেন। তারপর এই সমাধির অবস্থানটাই তিনি একটা নকশা তৈরি করে দেখিয়ে দিয়ে যান, সেই নকশাই আমার হাতে পড়ে।

আমরা হতবাক! এসব কি গল্প? তাহলে জলদস্যুর গুপ্তধন ব্যাপারটা...

ইন্সপেক্টর খাঁড়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, লুই রিকার্দো তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমায় একটু বলতে দিন।

হ্যাঁ বলুন মিঃ লুই। আমি শুনতে চাই বাংলাদেশের দুর্ধর্ষ হার্মাদ পেড্রোর রত্নাকর থেকে বাল্মিকী হয়ে ওঠার কাহিনী।

ঠিক বলেছেন মিঃ ভরদ্বাজ, আপনি যা বললেন তা এদেশের মাটিতেই সম্ভব। জলদস্যু পেড্রো রিকার্দোর জীবনটাকেই বদলে দিয়েছিল এই বাংলার এক নারী—বিনোদিনী।

আরো অনেক নারী-পুরুষের সঙ্গে পেড্রোর দল এই তরুণীকে ধরে এনেছিল কোনো গ্রাম অথবা নদীর ঘাট থেকে। কিন্তু তাঁকে অন্যদের মতো বিক্রি করা হয়নি। পেড্রো রিকার্দোর ডায়েরি আমি পেয়েছি, তা থেকে জানতে পেরেছি এরপরই তাঁর জীবন পুরোপুরি পাল্টে যায়।

পেড্রো কি বিনোদিনীকে বিয়ে করেছিলেন? প্রশ্ন করলো মেঘনাদ।

হ্যাঁ, মিঃ ভরদ্বাজ। বিনোদিনীকে পেড্রো শুধু বিয়েই করেননি, তিনি দস্যুবৃত্তিও ছেড়েছেন। স্ত্রীর ধর্মকে আপন করেছেন। দস্যুগিরি করে অর্জিত সব সম্পদ সঙ্গীদের

বিলিয়ে দিয়ে স্ত্রী বিনোদিনীকে নিয়ে এই সুন্দরবনের নির্জন অঞ্চলে ঘর বেঁধেছেন। স্ত্রীর ইচ্ছামতো এখানে একটি অক্ষয় বট এবং শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপূজা শুরু করেছেন। তাঁদের একটি সন্তানও হয়েছিল।

তারপর?

কিন্তু এক্ষেত্রে বাল্মীকি হবার প্রচেষ্টা তাঁর ভাগ্যে সইলো না, হার্মাদ পেড্রোর এ পরিবর্তন মেনে নিল না অন্য জলদস্যুরা। তারা এক রাতে এসে শার্দূলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর ছোট্ট বাসভূমির ওপর। মন্দির তো ভাঙলোই, হত্যা করলো বিনোদিনীকে।

বলেন কি!

হ্যাঁ মিঃ মজুমদার, তাই তো বলছিলাম জঙ্গলের হিংস্রতম পশুও মানুষের চেয়ে বেশি হিংস্র হতে পারে না।

মৃত্যুর আগে বিনোদিনী তাঁর স্বামীকে শেষ একটি অনুরোধ করেছিলেন।

কী অনুরোধ? জিগ্যেস করলাম।

পেড্রো যেন তাঁর পাঁচ বছরের পুত্রটিকে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব নিজের দেশ পর্তুগালে ফিরে যান। সেখানে তাঁদের পুত্র যেন ভবিষ্যতে মানুষের মতো হয়ে উঠতে পারে এবং এ বংশে কেউ কোনোদিন যেন আর দস্যুগিরি না করে। পেড্রো তাঁর স্ত্রীর সে অনুরোধ রেখেছিলেন।

বলতে বলতে মাথা নিচু করলেন লুই রিকার্দো। ওঁর দু'চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো সেই সমাধিক্ষেত্রে।

কতক্ষণ আমরা বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম কে জানে। হঠাৎ দূর থেকে শোনা গেল গুলির শব্দ, হৈচৈ, সেই সঙ্গে ঘন ঘন বাঘের গর্জন।

আমরা সবাই চমকে উঠলাম। কথা-বার্তার ঘোরে ভুলেই বসেছিলাম একটু দূরে ফ্রান্সিস এবং জটাই সর্দারের দলকে আমরা জনাকয়েক গার্ড এবং সুন্দরবনের এক রয়াল বেঙ্গল টাইগারের পাহারায় রেখে এসেছি। কিন্তু এর মধ্যে কী হলো ওখানে?

মেঘনাদ উত্তেজিত স্বরে বললো, চলুন ইন্সপেক্টর খাঁড়া—জলদি।

আমরা সবাই দৌড়োলাম। লুই রিকার্দোও আমাদের সঙ্গে চললেন।

বেশি পথ নয়। মন্দিরটা ছাড়িয়ে আর একটুখানি। সেটুকু পথ দৌড়ে যেতেই চোখে পড়লো। গোলমালটা পাকিয়েছে ফ্রান্সিস।

অন্যদের সঙ্গে তাকেও একটা গাছের সঙ্গে দু'হাত বেঁধে রেখে যাওয়া হয়েছিল। কোনোভাবে সে হাতের বাঁধন খুলে ফেলে কোমরের লুকোনো জায়গা থেকে বার করেছে রিভলবার, চকিতে পরপর দুটো গুলি ছুঁড়ে আহত করেছে আমাদের দুজন গার্ডকে। ওরা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। কিন্তু তারপরই ঘটেছে আর একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা। ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করতে দেখে লুই রিকার্দোর পোষা বাঘ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তাড়া করেছে ফ্রান্সিসকে।

অকুস্থলে পৌঁছে দেখলাম ফ্রান্সিস বাঘের কবল থেকে বাঁচবার জন্যে প্রাণপণে ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে। তাকে তাড়া করে চলেছে সুন্দরবনের রাজা। আমরা সবাই লুই রিকার্দোর দিকে তাকালাম। উনি বার কয়েক চিৎকার করে ডাকলেন—বেবি....বেবি.....। কিন্তু সুন্দরবনের ভয়াল ভয়ঙ্কর এতদিন ভালোবাসার গুণে পোষ মানলেও রক্তের গন্ধ তার বন্য স্বভাব ফের জাগিয়ে তুলেছে।

চোখের সামনে মানুষের সঙ্গে বাঘের দৌড় প্রতিযোগিতার দৃশ্য দেখতে লাগলাম। সে প্রতিযোগিতায় ফ্রান্সিস বোধকরি রয়াল বেঙ্গলকে হারিয়ে দেবারই উপক্রম করলো। সে পৌঁছে গেল জলের একেবারে কিনারে।

সেখানে অপেক্ষা করছিল আর এক ত্রাস। জলের ধারে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল এক বিশাল কুমীর। ফ্রান্সিস তার নাগালে পৌঁছতেই কুমীরটা এক ঝটকায় ফ্রান্সিসকে ফেলে দিল পাড়ের ওপর। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দু'সারি ধারাল দাঁতে তাকে কামড়ে ধরে সড়সড় করে নেমে গেল গভীর জলে। দেখতে দেখতে জায়গাটা রক্তে লাল হয়ে উঠলো।

এ দৃশ্য চোখের ওপর দেখে একসঙ্গে আমরা সবাই শিউরে উঠলাম। পাশে দাঁড়িয়ে লুই রিকার্দো দু'হাতের তালুতে চোখ ঢাকলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন—বিনোদিনীর অভিশাপ। এমন হবে আমি আগেই জানতাম....আমি আগেই জানতাম....!

সুন্দরবনের বাতাসও যেন এসময়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে।

শুধু এক মুঠো মাটি

মোহনার জল কেটে আমাদের মোটর লঞ্চ ফিরে চলেছে। লঞ্চের পেছনে বাঁধা জটাই সর্দারের সেই ভটভটি। সেটা এখন আমাদের দখলে।

লঞ্চের একধারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে জটাই সর্দার আর তার সঙ্গী দস্যুরা। তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পাহারায় রয়েছে সশস্ত্র গার্ডরা। ওদের সবাইকে ইন্সপেক্টর খাঁড়া বন্দী করে নিয়ে চলেছেন সুন্দরবন মুলুকের পুলিশ হেড কোয়ার্টারে।

মোটর লঞ্চে নতুন সঙ্গী বলতে লুই রিকার্দো নামের আসল মানুষটি। সম্পর্কে তাঁর পিতামহী, সেই মহীয়সী বিনোদিনীর স্মৃতি আর বেবিকে ছেড়ে কিছুতেই আসতে চাইছিলেন না তিনি। অনেক কষ্টে মেঘনাদ ওঁকে রাজী করিয়েছে। এভাবে সুন্দরবনের নিষিদ্ধ কোর এলাকায় বাস করা আইনসিদ্ধ নয়।

ফেরার আগে লুই রিকার্দো বেবিকে যখন বিদায় জানাচ্ছিলেন, তখন সবার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। হিংস্র রয়াল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বের এমন দৃশ্য আর কেউ কোনোদিন দেখেছেন কিনা জানি না। বার বার লুই রিকার্দোর একটা কথাই আমার মনে হচ্ছিল—'ভালোবাসার শক্তি শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীর সকল প্রাণীকুলকে সমান ভাবে জয় করতে পারে।' এর চেয়ে বড় সত্য বোধকরি নেই।

ফেরার সময় ওখান থেকে শুধু একটা জিনিসই সঙ্গে নিয়েছেন লুই রিকার্দো। তা হলো বিনোদিনীর সমাধির এক মুঠো মাটি। লুই বলেছেন—এটাই আমার পূর্বপুরুষ পেড্রো রিকার্দোর রেখে যাওয়া আসল সম্পদ। এ আমি রেখে দেব সারা জীবন।

পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। অস্তগামী সূর্যের বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে পড়েছে সুন্দরবনের জল-স্থল-অন্তরীক্ষে। লুই রিকার্দোর দু'চোখেও সেই অস্তগামী সূর্যের বিষণ্ণতা।

আমরা কেউ কোনো কথা বলছিলাম না। মেঘনাদও কেমন যেন চুপচাপ। এখন শুধু আমাদের মোটর লঞ্চের অবিরাম জল কেটে এগিয়ে চলার যান্ত্রিক শব্দ।

(সমাপ্ত)

ছবি ঃ সমীর সরকার